বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৩ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২২

আঞ্চলিক ট্রানজিট ও বাংলাদেশ: কতিপয় বিবেচ্য বিষয়

মোহাম্মদ ইউনুস*

১। ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বিকাশমান অর্থনৈতিক অঞ্চল। তা সত্ত্বেও নানা ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এ অঞ্চলে এখনো পর্যন্ত কোনো সমন্বিত স্থল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। একদিকে কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার কারণে ভারতের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে অনুমিত ভারতীয় অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ ট্রানজিটের[১] পথে প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের এ ধরনের বিরোধীতার অন্যতম কারণ হলো ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি। ভারত দুটো প্রতিযোগী ব্লক – বিসিআইএম ও বিমসটেক – এর মধ্যে ঘুরপাক খেলেও, চীনের সাথে ঘনিষ্ট অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে বিসিআইএম করিডর প্রতিষ্ঠার উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব দিচ্ছে। ভুটান ও নেপালের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বর্তমানে পণ্য ও কনটেইনার জটগ্রস্ত কলকাতা বন্দর ব্যবহার করে সম্পন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এ সবগুলোই হলো আঞ্চলিক ট্রানজিট চুক্তি না থাকার বিরূপ ফলাফল। যেহেতু বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে পরিবহন খরচ হলো প্রতিযোগিতা সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক, সেহেতু একটি দক্ষ ও সমন্বিত ট্রানজিট ব্যবস্থার গুরুত্বকে বাড়িয়ে বলার কোনো যুক্তি নেই।

ভারতের প্রায় স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের (অরুণাচল, আসাম, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা) এবং চীনের ইউনান প্রদেশের সাথে বাংলাদেশের অনুপম ভৌগোলিক অবস্থান রয়েছে। সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত ভুটান ও নেপাল বাংলাদেশের পশ্চাৎভূমি। বাংলাদেশের দুটো সমুদ্র বন্দর রয়েছে যথা চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর। অধিকন্তু পটুয়াখালী জেলায় পায়রা সমুদ্র বন্দরের নির্মাণ কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। এসব বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্থলবেষ্টিত এসব দেশ ও অঞ্চলকে বন্দর সেবা দিতে পারে। অধিকন্তু বাংলাদেশ যেহেতু কক্সবাজার জেলার মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করতে যাচ্ছে সেহেতু চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ সন্দেহাতীতভাবে এ অঞ্চলের ট্রানজিট হাবে পরিণত হবে।

সরাসরি ট্রানজিট করিডরের অনুপস্থিতি এবং সমুদ্র বন্দরের নৈকট্যহীনতার কারণে বর্তমানে এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান পরিবহন খরচের মোকাবিলা করছে। এসব অসুবিধার কারণে

---

* সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস। প্রবন্ধটি রিভিউ করে দেয়ার জন্য লেখক জনৈক রিভিউয়ারের নিকট কৃতজ্ঞ।

[১] গ্যাট, ১৯৯৪ (ধারা ৫, অনুচ্ছেদ ১) অনুযায়ী কোনো (ফ্রেইট) ট্রাফিক যদি কোনো দেশে প্রবেশের পূর্বে যাত্রা শুরু করে এবং উক্ত দেশের বাইরে যাত্রা শেষ করে তবে তাকে ট্রানজিট ট্রাফিক বলা হয়ে থাকে। ট্রানজিট, করিডর ও ট্রান্সশিপমেন্ট প্রায়শ সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এ তিনটি প্রত্যয় পরস্পর থেকে পৃথক। ট্রানজিট বা বাণিজ্যের জন্য সংযোগ প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলেও এসবের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট প্রয়োজনীয়ও নয় এবং পর্যাপ্তও নয়।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি কঠিন ও অদক্ষ হয়ে পড়ছে। যেমন 'চিকেন নেক'[২] হয়ে ভারতের মূল অংশের সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য করতে হলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে গড়ে প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হয়। অন্যদিকে চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে অন্যান্য অঞ্চলে বাণিজ্য পণ্য প্রেরণ করতে হলে ২,০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরবর্তী দক্ষিণ চীন সাগরে পাঠাতে হয় এবং তারপর ট্রান্সশিপমেন্টের ব্যবস্থা করতে হয়।

বাংলাদেশের বন্দরসমূহের মাধ্যমে প্রচলিত করিডর ব্যবহারের জন্য ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোনো ধরনের চুক্তি না থাকায় চিকেন নেকের মাধ্যমে প্রায় ১,৪০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতা বন্দরে এসে আসামের চা ইউরোপে রপ্তানি হয়। অথচ বাংলাদেশের বন্দরের মাধ্যমে প্রচলিত করিডর ব্যবহার করা হলে দূরত্ব কমে অর্ধেকে নেমে আসবে। যেমন আগরতলা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব মাত্র ৪০০ কিলোমিটার। চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও চীনের কুনমিং-এর জন্য একটি সাউদার্ন করিডর করা হলে দূরত্ব কমে প্রায় ৭০০ কিলোমিটারে নেমে আসবে। একইভাবে ট্রানজিট সুবিধার মাধ্যমে ভুটান ও নেপাল নানাভাবে উপকৃত হতে পারে এবং তাদের বহির্বাণিজ্যে মংলা বা পায়রা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।

বাংলাদেশের জন্য এটি অনুধাবন করা অপরিহার্য যে, এ অঞ্চলের বাইরে এই ট্রানজিট সেবার কোনো বাজার নেই। একইভাবে ভুটান, চীন, ভারত এবং নেপালেরও উপলব্ধি করতে হবে যে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশ এ সেবা প্রদান করতে পারবে না। ট্রানজিটের স্বাধীনতা (freedom of transit) ধারণা অনুসারে ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে পণ্য পরিবহন করলে সে কাজে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কোনো বাধা সৃষ্টি বা বিলম্ব করা যাবে না এবং ট্রানজিট পণ্য শুল্ক বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মাসুলের আওতামুক্ত থাকবে (ধারা ৫, অনুচ্ছেদ ২, গ্যাট ১৯৯৪)। তবে বাংলাদেশ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারত ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক বা সার্ভিস প্রদান সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তিসঙ্গত হারে মাসুল ও ফি আরোপ করতে পারে। এমনকি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিবিধান বাদ দিলেও এটা তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে এ অঞ্চলের দেশগুলো বর্তমানে চলমান অসহযোগিতামূলক নীতির পরিবর্তে সহযোগিতামূলক উদ্যোগ, কৌশল ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অধিকতর লাভবান হবে। বস্তুত বাংলাদেশ, ভুটান, চীন, ভারত ও নেপাল সবাই ট্রানজিট সেবা প্রদানে সহযোগিতা করে বিপুলভাবে লাভবান হতে প্রস্তুত রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক দিয়ে ট্রানজিট থেকে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হলেও দূরত্ব, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ের দিক দিয়ে ভুটান, চীন, ভারত ও নেপাল পরোক্ষভাবে লাভবান হবে।

বাংলাদেশ একবার ট্রানজিট সুবিধা দিলে পণ্য পরিবহনে ভুটান, চীন, ভারত, নেপাল ও মিয়ানমারের বাড়তি খরচ লাঘব হবে বলে নিম্নোক্ত কারণে ধারণা করা হয়: (১) বাংলাদেশ, ভারত এবং মিয়ানমারের ভিতর দিয়ে সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি ট্রানজিট করিডরের কারণে এবং (২) যাতায়াতের দূরত্ব কমে আসার ফলে যাতায়াত সময়ের সাশ্রয় হওয়ার কারণে। এর ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রাসঙ্গিক বিধিবিধান ও নিয়মকানুনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরোপিত মাসুল ও ফি-এর আয় থেকে লাভবান হবে।

---

[২]ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সীমান্তে অবস্থিত সংকীর্ণ ভারতীয় ভূখণ্ড যা 'চিকেন নেক' নামে সমধিক পরিচিত। এর এক পাশে রয়েছে বাংলাদেশ এবং অন্য পাশে ভুটান ও নেপাল।

ট্রানজিটের পক্ষে ও বিপক্ষে যেকোনো সিদ্ধান্ত অর্থনীতি, রাজনীতি ও আঞ্চলিক উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কে মারাত্মক প্রশ্নের সৃষ্টি করে। এরূপ একটা প্রেক্ষাপটে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহ, চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ, বিশেষ করে ইউনান, এবং ভুটান ও নেপালের জন্য ট্রানজিট গেটওয়ে হলে যেসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে ভূমিকার পর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সম্ভাব্য ট্রানজিট করিডরগুলোর প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে; তৃতীয় অনুচ্ছেদে এ অঞ্চলের দেশগুলো বিভিন্ন সময়ে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদ্যোগের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে; চতুর্থ অনুচ্ছেদে হ্রাসকৃত দূরত্ব, পরিবহন সময় এবং প্রতি টন খরচ সাপেক্ষে প্রস্তাবিত করিডরগুলোর প্রতিযোগিতামূলক দিকগুলো নিরীক্ষা করা হয়েছে; পঞ্চম অনুচ্ছেদে ভুটান, চীনের ইউনান, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং নেপাল থেকে কি পরিমাণ পণ্য পরিবাহিত হবে এবং তার কত অংশ বাংলাদেশের উপর দিয়ে পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার মোট পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম অনুচ্ছেদে অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধাদির উন্নয়নে বাংলাদেশের কি পরিমাণ ব্যয় করা প্রয়োজন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিবিধানের আওতায় কি কি মাসুল ও ফি আদায় করতে পারে, প্রতিটা করিডরের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা/ব্যবহারযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। নবম অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত ট্রানজিট কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে যেসব ইস্যুর উদ্ভব হতে পারে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শেষত দশম অনুচ্ছেদে কিছু উপসংহারীয় মন্তব্য প্রদানের পাশাপাশি ট্রানজিট ব্যবস্থাকে অর্থবহ ও কার্যকর করতে কিছু প্রস্তাব ও পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২। সড়ক, রেল ও নৌপথের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশ এবং এ অঞ্চলের সবগুলো স্থলবেষ্টিত বা প্রায় স্থলবেষ্টিত দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে ট্রানজিট সেবার জন্য ১৫টি আলাদা করিডরকে (৮টি সড়ক, ৫টি রেল ও ২টি নৌ করিডর) বিবেচনা করা যেতে পারে। এই নিরীক্ষা ট্রানজিটের মূল দুটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। প্রথমত, ভুটান, চীন, নেপাল ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো কর্তৃক চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের ফলে যে সম্ভাবনা দেখা দিবে তা বিশ্লেষণ করা। দ্বিতীয়ত, কলকাতা হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং তারপর মিয়ানমার ও চীনে পণ্য পরিবহনের করিডর হিসেবে বাংলাদেশের সড়ক, রেল ও নৌপথ ব্যবহার বিশ্লেষণ করা। যেহেতু ট্রানজিটের সফল বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত নির্বিঘ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সেহেতু প্রথমে আঞ্চলিক ট্রানজিট ব্যবস্থায় বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ সম্পর্কে ধারণা নেয়া গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষে আলোচনার সুবিধার্থে সড়ক, রেল ও নৌপথে বিদ্যমান সমস্যাদি আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সড়কপথ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যেকার স্থল বাণিজ্যের প্রায় ৭০ ভাগ সীমান্ত সংলগ্ন বেনাপোল/পেত্রাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। পেত্রাপোলের সাথে কলকাতা সংযোগকারী একমাত্র সড়কটি অতি সরু (মাত্র ৫.৫ মিটার চওড়া) এবং এ সড়কে যানবাহনের চাপও অত্যাধিক। এক দেশের পণ্যবাহী ট্রাক সীমান্ত অতিক্রম করে অন্যদেশে যেতে পারে না। ফলে সকল পণ্যবাহী যানকে সীমান্তে পণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট করতে হয় অর্থাৎ এক দেশের যান থেকে খালাস করে

অন্য দেশের যানে স্থানান্তর করা হয়। এতে স্থলবন্দরে যেমন পণ্যবাহী যানের দীর্ঘ জট সৃষ্টি হয়, তেমনি পণ্য স্থানান্তরে সময় বেশি লাগে ও খরচ বেশি পড়ে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের সরাসরি ট্রাক যাতায়াত নেই বরং স্ব স্ব বর্ডারে ট্রানজিট পণ্যের ট্রান্সশিপমেন্ট ঘটে। বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যেকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের জন্য বাংলাবান্ধা/ফুলবাড়ী করিডর এবং বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যেকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের জন্য বুড়িমারী-চেংড়াবান্ধা করিডর ব্যবহারের জন্য ভারত অনুমতি দেয়। যদিও এসব করিডরে বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের অংশগুলো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয়, ভারতের অংশগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বলতে গেলে প্রায় উপেক্ষিত।

রেলপথ

ভারতের মালবাহী রেল যানগুলো বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন স্টেশনগুলোতে যাতায়াত করে এবং বাংলাদেশের রেল ইঞ্জিন ভারতীয় রেল ওয়াগনগুলোকে টেনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসার পর সেগুলো থেকে পণ্য ট্রান্সশিপমেন্ট করে পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের রেল ওয়াগনে তোলা হয়। বাংলাদেশের রেল ওয়াগনগুলো ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে না কারণ বাংলাদেশী রেল ইঞ্জিনগুলোর ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃক ব্যবহৃত এয়ার ব্রেকড মালবাহী ওয়াগনকে সবলে টানার ক্ষমতা নেই; এমনকি বর্তমানে পণ্যবাহী যানের পরিমাণ কম হলেও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রেল স্টেশনগুলোর লুপস, ইয়ার্ডস ও টার্মিনালের পণ্য ধারণ ক্ষমতা অপর্যাপ্ত (এসআরএমটিএস, ২০০৬)। যমুনা সেতুর উপর দিয়ে পণ্যবাহী ভারী কনটেইনার ও যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকায় সেতুর উপর দিয়ে পূর্ণ বোঝাই ব্রডগেজ ওয়াগন চলতে পারে না[৩] যদিও ঢাকা পর্যন্ত ডুয়েল গেজ রেলওয়ে নেটওয়ার্ক বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের গাজীপুরের ধীরাশ্রমে দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) নির্মিত ও কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ব্রডগেজ ও মিটারগেজ ট্রেনের মধ্যেকার ট্রান্সশিপমেন্ট ঢাকার কমলাপুরের আইসিডিতে হতে পারে।

নৌপথ

নৌপথসমূহ হলো এ অঞ্চলে কম খরচে পণ্য পরিবহনের একটি সম্ভাব্য বিকল্প উপায়। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ধারা ৫ অনুযায়ী ১ নভেম্বর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদি অভ্যন্তরীণ নৌ ট্রানজিট ও বাণিজ্য প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। তারপর থেকে এ চুক্তি নিয়মিতভাবে নবায়ন হয়েছে। এ প্রটোকলে পণ্যবাহী নৌযানের জন্য অভিন্ন ডকুমেন্টেশন, নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, ক্লিয়ারেন্স ও রেমিটেন্স, অভিন্ন টোল, মাসুল ইত্যাদির বিধান রাখা হয়। পণ্য পরিবহন খরচ কম হওয়ার পাশাপাশি আন্ত:সীমান্ত ট্রান্সশিপমেন্টের আবশ্যকতা না থাকা সত্ত্বেও অপ্রতুল নেভিগেশনাল উপকরণ, দ্রুত পলি ভরাট হওয়া, নৌযানের কম গতি এবং ভৌত প্রতিবন্ধকতা যেমন দুর্বল পণ্যাগার সুবিধাদি ও বন্দরে প্রবেশ পথ সংকীর্ণ হওয়া ইত্যাদি কারণে অভ্যন্তরীণ নৌপথ করিডরের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা নেই (থাপলিয়াল, ১৯৯৯)।

[৩]সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে ১০০৯ মি.মি. ফ্লোর উচ্চতাসম্পন্ন বিসিএলএ/বিএলসিবি ফ্ল্যাট গাড়ির ওপর আইএসও মান নিয়ন্ত্রিত কনটেইনারগুলো কোনো লোড বিধিনিষেধ ছাড়াই সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে।

৩। ট্রানজিটের উদ্যোগসমূহ

এ অঞ্চলের দেশগুলো আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেখানে ট্রানজিট হচ্ছে একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। তবে বিপুল সংখ্যক আঞ্চলিক গ্রুপিং, সংগঠন, ফোরাম, সাবফোরাম, উদ্যোগ, প্রকল্প, চুক্তি ইত্যাদির কার্যকর প্রভাব প্রত্যক্ষ করা অত্যন্ত দুষ্কর। এসব ফোরাম সময়ে সময়ে একে অন্যের বিরোধী হয়ে থাকে যার শর্তগুলো হয় বিপরীতমুখী। এসব উদ্যোগের প্রতি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নতুন যুগের সূচনা করলেও নীতিনির্ধারকদের ব্যক্ত ইচ্ছা বা সদিচ্ছার প্রভাব এখন পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ কোনো ধরনের দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ট্রানজিট চুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া বা চুক্তিতে সম্মত হওয়ার আগে তাই প্রধান প্রধান উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

বিমসটেক উদ্যোগ: বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে বিসটেক গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটান যোগ দিলে এর নাম হয় বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়াটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন বা বিমসটেক। এটি সড়ক, রেল, আকাশ (ডিজিটাল কানেকটিভিটি ও বিদ্যুৎ করিডরসহ) কানেকটিভিটির ওপর জোর দেয়। বাণিজ্য উদারীকরণ এবং যাত্রী, পণ্য ও সেবাদির অবাধ চলাচল হলো এ কানেকটিভিটির কেন্দ্রীয় বিষয়। বিমসটেক এলাকায় প্রচুর অব্যবহৃত প্রাকৃতিক, জলজ ও মানব সম্পদ রয়েছে। এ জোটের সহযোগিতার ১৪টি অগ্রাধিকার খাত রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি অগ্রাধিকার খাত ১৯৯৮ সালে এবং অবশিষ্ট ৭টি খাত ২০০৫ সালে চিহ্নিত হয়।

কুনমিং/বিসিআইএম উদ্যোগ: ভারতের পূর্বমুখী নীতির সাথে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ ইউনানের উন্নয়ন পরিকল্পনার সংযোগ ঘটানোর চিন্তাভাবনা থেকেই কুনমিং উদ্যোগ জন্ম নেয়। স্থলবেষ্টিত যেসব এলাকার উপর দিয়ে একদা সাউদার্ন সিল্ক রোড যেতো এবং বণিকদের ভিড় ও পদচারণায় মুখর ছিল সেসব এলাকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ১৭ আগস্ট ১৯৯৯ সালে ট্র্যাক-২ (কুনমিং) উদ্যোগ স্বাক্ষরিত হয়, যা বিভিন্ন দিক দিয়ে অভিনব। কে-টু-কে নামে পরিচিত করিডরটি চীনের কুনমিং থেকে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ হয়ে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত, যা ২,৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং করিডর হিসেবে এর ব্যবহার ব্যাপক সম্ভাবনাময়। এ অঞ্চলে ভৌত অবকাঠামোর অতি দ্রুত উন্নতি ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে দীর্ঘ আলোচনান্তে বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমার ২০১৩ সালে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করে এবং ট্র্যাক-১ (বিসিআইএম) উদ্যোগ স্বাক্ষরিত হয়। এটি চার জাতি কর্তৃক বিসিআইএম- এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির সূচনা করে এবং সম্মত হয় যে করিডরটি কুনমিং থেকে শুরু হয়ে মিয়ানমারের মান্দালয় ও বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম হয়ে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

সার্ক ও উপ-আঞ্চলিক উদ্যোগসমূহ: ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে পরিবহন, ট্রানজিট ও যোগাযোগ লিংক জোরদারের আহ্বান জানানো হয়। সে অনুসারে ২০০৬ সালে একটি বিশদ সমীক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় (এসআরএমটিএস, ২০০৬)। এ সমীক্ষায় আঞ্চলিক গেটওয়ে হিসেবে কাজ করবে এমন কতিপয় সম্ভাব্য ও বিদ্যমান পরিবহন করিডর চিহ্নিত করার পাশাপাশি সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পণ্য ও যাত্রীর দক্ষ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রধান ভৌত, অভৌত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের

তালিকা করা হয়। এসআরএমটিএস এর অনেকগুলো সুপারিশ ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে নতুন সদস্য ও পর্যবেক্ষক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সার্ক সম্প্রসারিত হলেও সদস্য দেশগুলোর অনীহার কারণে বর্তমানটিসহ অনেক আঞ্চলিক উদ্যোগই সার্কের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দেয়া যায়নি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার চির বৈরিতার কারণে সার্কের এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হবে কিনা তা একটি বিতর্কিত বিষয়।

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ইশতেহার: ২০১০ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ ও ভারত একটি ঐতিহাসিক যৌথ ইশতেহারে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুর উপর দৃষ্টিপাত করা হয়। ট্রানজিটের পরিপ্রেক্ষিতে এ ইশতেহারের বেশকিছু ধারা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এর কয়েকটি হলো: বাংলাদেশের আশুগঞ্জ ও ভারতের শিলঘাটকে "পোর্ট অব কল" হিসেবে ঘোষণাকরণ এবং আশুগঞ্জ থেকে ত্রিপুরায় সড়কপথে ট্রান্সশিপমেন্ট (ধারা ২২); (২) সড়ক ও রেলপথে ভারত থেকে পণ্য আনা-নেয়ায় মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ দেয়া (ধারা ২৩)[৪]; (৩) আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ স্থাপন (ধারা ২৪); (৪) নেপালকে রেলপথে ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার নিমিত্তে রোহানপুর-সিঙ্গাবাদ ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন তৈরি এবং ভুটানকে রেলওয়ে ট্রানজিট সংযোগ দিতে রাধিকাপুর-বিরল রেলপথকে ব্রডগেজ লাইনে পরিণত করা (ধারা ২৫); (৫) প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে অবকাঠামো তৈরি করে সাব্রুম-রামগড় এবং দেমাগিরি-থেগামুখ স্থল কাস্টমস স্টেশনগুলোকে কার্যকর করা (ধারা ৩৫); (৬) দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে রেল ও নৌ ট্রানজিট করিডরের মাধ্যমে কনটেইনার বহন (ধারা ৩২); (৭) ভুটান ও নেপালকে বাংলাবান্ধা-ফুলবাড়ী করিডর ব্যবহারের সুযোগ দেয়া (ধারা ৩৭); এবং (৮) রেল অবকাঠামো, ব্রডগেজ রেল ইঞ্জিন ও যাত্রীবাহী কোচ সরবরাহ, সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপ পুনর্গঠন ও মেরামত, আর্টিকুলেট বাস ক্রয় এবং ড্রেজিং প্রকল্প ইত্যাদি বাবদ বাংলাদেশকে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের ঘোষণা (ধারা ৩৮)।

বিবিআইএন এমভিএ চুক্তি: নির্বিঘ্ন উপ-আঞ্চলিক কানেকটিভিটি, অর্থনৈতিক বিষয়ে গভীরতর সম্পৃক্ততা ও মানুষে মানুষে যোগাযোগ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সার্কভুক্ত চারটি স্থায়ী সদস্যদেশ– বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল–২০১৫ সালে মোটরযান চুক্তি (বিবিআইএন-এমভিএ) স্বাক্ষর করে। এ চারটি দেশের মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক চুক্তিটি ইতোমধ্যে অনুসমর্থিত হয়েছে। এ চুক্তিতে মোট ১৭টি ধারা রয়েছে যা চারটি দেশের মধ্যে যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনের অবাধ ও নির্বিঘ্ন চলাচলের জন্য সার্ক সনদে বর্ণিত অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার গুরুত্বকে ধারণ করে। বিবিআইএন-এমভিএর উদ্দেশ্যসমূহ হলো: (১) চারটি দেশের মধ্যে যাত্রী, ব্যক্তিগত ও পণ্যবাহী যানের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা, (২) আঞ্চলিক সম্পৃক্ততার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরিতে দেশগুলোকে সহায়তা করা, (৩) উপ-আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহজতর করা, এবং (৪) সড়ক পথে পণ্য ও যানের অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা করে আঞ্চলিক কানেকটিভিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘনিষ্ট আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা।

চুক্তিকারী সংশ্লিষ্ট দেশগুলো কর্তৃক পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে যানবাহনগুলো অনুমোদিত ইমিগ্রেশন চেক পয়েন্ট ও স্থল কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে অনুমোদিত রুট ব্যবহার করবে। বিবিআইএন-এমভিএ চুক্তির আওতায় প্রতিটি দেশ চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ব্যয় নিজেরাই বহন

[৪]ইশতেহার বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটানকে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করার সুযোগ দেবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

করবে এবং ফি, প্রশাসনিক ব্যয় ও সেবা মাসুল ইত্যাদি দ্বিপাক্ষিকভাবে নির্ধারণ করবে। প্রতিটি দেশের একটি জাতীয় কমিটি থাকবে যা চুক্তির সমন্বয় ও মনিটরিং এর কাজ করবে। এছাড়া একটি উপ-আঞ্চলিক যৌথ কমিটি থাকবে যা স্থল পরিবহন সহজতর করার প্রক্রিয়া দেখভাল করার পাশাপাশি চুক্তির বাস্তবায়ন কাজের সমন্বয়সাধন ও মনিটর করবে। তবে যে মৌলিক প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হলো: যেখানে চারটি দেশের মধ্যে কাস্টমস ও ট্যারিফ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির এখনও সমাধা হয়নি, অনেক বর্ডার ক্রসিং পয়েন্টের কোনো সমন্বিত চেক পোস্ট নেই এবং সড়কের অবস্থা খুবই খারাপ, সেখানে বিবিআইএন-এমভিএ চুক্তি কি পণ্য, যানবাহন ও মানুষের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করবে? এসব কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিবে।

এভাবে বাংলাদেশ পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ করিডরসমূহের বিষয়ে আগ্রহী হয়। পূর্ব-পশ্চিম করিডরসমূহ দিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্যের একটি বৃহৎ অংশ স্থল বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। যদি এসব করিডর দক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় এবং যথাযথভাবে চীনের সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে বর্তমানে পণ্য পরিবহনে যে খরচ হয় তাতে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উত্তর-দক্ষিণ করিডরসমূহ চট্টগ্রাম, মংলা সমুদ্র বন্দর ও প্রস্তাবিত মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দরের সাথে বিসিআইএম-এর অন্তর্ভুক্ত পশ্চাৎভূমিকে সংযুক্ত করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এসব করিডর, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এলাকার সাথে অধিক্রমণ করে, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশগুলোর জন্য অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিবে।

৪। করিডরসমূহের পর্যালোচনা

বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ছয়টি দেশে ট্রানজিটের বিকল্প করিডরসমূহের লাভ-ক্ষতি পরিমাপ করা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবেচনাধীন করিডরসমূহের আলোচনার দুটো দিক রয়েছে। প্রথমত, কলকাতা থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্য করিডরসমূহ বর্ণনা করা। দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে ভুটান, নেপাল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল হয়ে চীন পর্যন্ত সম্ভাব্য করিডরসমূহ আলোচন করা। করিডরসমূহের আলোচনা বাংলাদেশ এলাকার মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে এ কারণে যে বাংলাদেশ এলাকার বাইরে এসব করিডরের সম্ভাব্য উত্তম বিকল্পসমূহ ব্যবহৃত হবে। এরূপ ধারণা বর্তমান আলোচনায় খুব একটা পার্থক্য হয়ে দাঁড়াবে না কারণ আলোচনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান করিডরসমূহের (কলকাতা থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত) বিপরীতে সম্ভাব্য করিডরসমূহের ব্যয় ও সুবিধা বা লাভ-ক্ষতি তুলে ধরা।

গ্যাট দলিল অনুযায়ী একটি দেশের ভিতর দিয়ে, আন্তর্জাতিক ট্রানজিটের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক করিডরসমূহ হয়ে, অন্য দেশকে বাধাহীন ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে (ধারা ৫, অনুচ্ছেদ ২, গ্যাট ১৯৯৪)। সার্ক আঞ্চলিক বহুমাত্রিক পরিবহন ব্যবস্থা শীর্ষক সমীক্ষায় (এসআরএমটিএস, ২০০৬) সমগ্র দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে ট্রানজিটের জন্য বহুসংখ্যক করিডর চিহ্নিত করার পাশাপাশি সেগুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। যাহোক বাংলাদেশ, ভুটান, চীন, ভারত, মিয়ানমার ও নেপালের সড়ক, রেল ও নৌপথ নেটওয়ার্কের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে ১৪টি করিডর আর্থিক দিয়ে লাভজনক কিনা তা যাচাই বা মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অধিকন্তু এ ১৪টি করিডরকে

ভৌগোলিক নৈকট্যতা, সরাসরি ট্রান্সপোর্ট লিংক (ব্যয় সাশ্রয়ী, সহজ এবং দূরত্ব ও সময় সাশ্রয়ী) ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে তিনটি নোডাল পয়েন্ট বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো উত্তরে গোয়াহাটি, পূর্বে শিলচর এবং দক্ষিণপূর্বে আগরতলা।[৫],[৬] এসব নোডাল পয়েন্টের মাধ্যমে ট্রানজিট করিডর নিম্নোক্তভাবে ট্রানজিট পণ্য পরিবহন করবে: গোয়াহাটি নোডাল পয়েন্ট থেকে ট্রানজিট করিডর শিলং ও মেঘালয়ের পূর্ব অংশ থেকে আসা ও সেসব এলাকাগামী ট্রাফিক ডাউকি/তামাবিলের মাধ্যমে; শিলচর নোডাল পয়েন্ট থেকে ট্রানজিট করিডর সমগ্র মনিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ড, আসামের দক্ষিণাংশ এবং ইউনান প্রদেশের অংশ বিশেষ থেকে আসা ও সেসব এলাকাগামী ট্রাফিক সুতারকান্দির মাধ্যমে; এবং আগরতলা নোডাল পয়েন্ট থেকে ট্রানজিট করিডর ত্রিপুরা ও ইউনান প্রদেশের অংশবিশেষ থেকে আসা ও সেসব এলাকাগামী পণ্য পরিবহন করবে।

প্রথম নোডাল পয়েন্ট থেকে কেবল সড়ক পরিবহনে, দ্বিতীয় নোডাল পয়েন্ট থেকে সড়ক ও রেল উভয় পরিবহনে এবং তৃতীয় নোডাল পয়েন্ট থেকে সড়ক, রেল ও নৌ এ তিনটি পরিবহনে পণ্য ট্রানজিট হবে। আন্ত:রাজ্য ট্রাফিকের ক্ষেত্রে রেল ও সড়কের মাধ্যমে ট্রান্সপোর্ট করিডর বেনাপোল ও দর্শনা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাবে; নৌপথের মাধ্যমে করিডর বাংলাদেশের মংলা হয়ে কলকাতা বন্দরে যাবে।

অধিকন্তু ভুটান ও নেপালের জন্য আরও তিনটি নোডাল পয়েন্ট বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো ফুন্টশলিং, বীরগঞ্জ ও কাঠমুন্ডু। এসব পয়েন্টের মাধ্যমে ট্রানজিট করিডর নিম্নোক্তভাবে পণ্য পরিবহন করবে: কাঠমুন্ডু নোডাল পয়েন্ট থেকে ট্রানজিট করিডর নেপাল এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহ (যেমন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার) থেকে আসা ও সেসব এলাকাগামী সড়ক ট্রাফিক বাংলাবান্ধার মাধ্যমে; বীরগঞ্জ নোডাল পয়েন্ট থেকে ট্রানজিট করিডর নেপাল থেকে আসা ও নেপালগামী রেল ট্রাফিক রোহানপুরের মাধ্যমে; এবং বুড়িমারীর মাধ্যমে ফুন্টশলিং নোডাল পয়েন্ট থেকে ট্রানজিট করিডর ভুটান এবং আসামের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা (ককরাজহর ও ধুবরী) সমূহ থেকে আসা ও সেসব এলাকাগামী পণ্য পরিবহন করবে। এ তিনটি নোডাল পয়েন্টের মাধ্যমে ট্রানজিট করিডরসমূহ এসব দেশের আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহন করবে। এ তিনটি নোডাল পয়েন্ট থেকে আমদানির উৎস বা রপ্তানির গন্তব্য পরিবহনের ধরন (রেল বা সড়ক) নির্বিশেষে হবে মংলা বন্দর।

---

[৫]গুন্দম-তুমব্রু করিডরের কথা বিসিআইএম উদ্যোগে বাংলাদেশের প্রস্তাবে উল্লেখ থাকলেও কিছু বাস্তবসম্মত সমস্যার কারণে এটিকে বিশ্লেষণ করা হয়নি। বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সড়ক প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ নাফ নদীর উপর দু' লেনবিশিষ্ট ৪৩ মিটার দীর্ঘ সেতু, ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে নিজস্ব অর্থায়নে মিয়ানমার অংশে তুমব্রু থেকে বলিবাজার পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার সড়ক তৈরি এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বলিবাজার থেকে ক্যাকটাউ পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার সড়ক তৈরির প্রস্তাব দিলেও এ পর্যন্ত এসব ক্ষেত্রে খুব সামান্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

[৬]বাংলাদেশ ভারত যৌথ ইশতেহারে দেমাগিরি-থেগামুখ করিডরের উল্লেখ থাকলেও কিছু বাস্তব সমস্যার কারণে এ করিডর বিশ্লেষণ করা হয়নি।

প্রতিযোগী ও বিদ্যমান করিডরসমূহ

গ্যাট এর ধারা ৫ এবং ইউনুস (২০১৩) কর্তৃক চিহ্নিত ট্রানজিট করিডরসমূহের পর্যালোচনা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী ও দক্ষ ট্রানজিট হিসেবে কাজ করতে তাদের উপযুক্ততা যাচাইয়ে ১৫টি করিডর চিহ্নিত করা হয়। ম্যাপ ১-৩ এ রেল, সড়ক ও নৌপথের সম্ভাব্য বিকল্প করিডরসমূহ দেখানো হয়েছে যেগুলো কলকাতা, চট্টগ্রাম ও মংলা থেকে শুরু হয়েছে এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ভুটান ও নেপালের তিনটি পৃথক অংশে শেষ হয়েছে। বিসিআইএম-এর প্রেক্ষিত থেকে সড়ক-২ এবং রেল-৩ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট করিডর কেননা এ দুটো করিডর শিলচরে শেষ হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য করিডরের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অংশ এরকম: শিলচর-ইম্ফাল-কালে-মান্দালাই-রুইলি-তেংচং-এরাই লেক-ডালি-কুনমিং। বর্তমান বিশ্লেষণে অন্য সব করিডর যেগুলো আগরতলা ও গোয়াহাটিতে শেষ হয়েছে সেগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করা হবে এ কারণে যে বিসিআইএম-এর আরও অগ্রগতি ও উন্নতি হলে ইম্ফালের সাথে আগরতলা ও গোয়াহাটিকে যুক্ত করার যেমন সম্ভাব্য বিকল্প থাকবে, তেমনি কুনমিংকে এসব বিকল্প করিডরের সাথে যুক্ত করার বিকল্পসমূহ খোলা থাকবে।

বিদ্যমান করিডর থেকে বাণিজ্য পণ্য নতুন করিডর দিয়ে পরিবাহিত হওয়া দূরত্ব, ইউনিট প্রতি পরিবহন খরচ ও যাতায়াত সময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান তুলনামূলক সুবিধার উপর নির্ভর করে। এ তিন ধরনের সুবিধা কোনো একটি করিডরে বিদ্যমান থাকলে সে করিডর দিয়ে বিদ্যমান করিডরের শতভাগ পণ্য পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবে এ তিনটি উপাদানের, বিশেষ করে শেষ দুটোর কোনো একটিতে কোনো অসুবিধা থাকলে তা একটি করিডরকে দুর্বল করিডরে বা দুর্বল প্রতিযোগীতে পরিণত করে।

ট্রানজিট পণ্য পরিবহন সাধারণত নোডে শুরু হয়ে নোডেই শেষ হয় এবং পণ্যবাহী যান লিংক বা সংযোগের মধ্য দিয়ে চলাচল করে। করিডরের মধ্য দিয়ে পণ্য ও যানের সহজ ও সাবলীল চলাচলের জন্য নোড ও লিংক উভয়টিকেই দক্ষভাবে কাজ করতে হয়। এমনকি দুটো করিডরের মধ্যেকার দূরত্ব সমান হলেও এ দুটোর যেকোনো একটিতে বিলম্ব হলে ইউনিট প্রতি পরিবহন খরচ বেড়ে যাবে বা যাতায়াত সময় বেশি লাগবে। এখানে অদক্ষ নোড ও লিংক যেগুলোতে অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধাদির উন্নয়নে অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে সেগুলো চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটা ট্রানজিট করিডরকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণের একটি প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

দূরত্ব, সময় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান করিডরসমূহের বিপরীতে প্রতিযোগী করিডরসমূহের তুলনামূলক সুবিধার তথ্যসমূহ ইউনুস (২০১৩) থেকে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সড়ক পরিবহন যানগুলোকে ট্রানজিট করিডরসমূহ দিয়ে পণ্য পরিবহনে গড়ে ৭০০ কিলোমিটার যাতায়াত করার প্রয়োজন হবে (সারণি ১)। বর্তমানে পরিবহন যানগুলোকে ১,০০০ কিলোমিটারের বেশি ঘুরপথ করতে হয়। সড়ক-৬ এর দূরত্ব সবচেয়ে কম (মাত্র ২৫৩ কিলোমিটার) অর্থাৎ এ পথে পণ্য পরিবহনে কম পথ যাতায়াত করতে হয়। সর্বোচ্চ দূরত্বের করিডরের রাস্তার ৫০ শতাংশ যেমন বাংলাদেশের ভিতরে পড়েছে, তেমনি ন্যূনতম দূরত্বের করিডরের (যেমন সড়ক-৬) প্রায় সবটাই বাংলাদেশের ভিতরে পড়েছে। এ করিডর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নেয়া হলে ঘুরপথ দূরত্বের প্রায় ৮৫ শতাংশ সাশ্রয় হবে। পক্ষান্তরে সর্বোচ্চ দূরত্ববিশিষ্ট করিডরে দূরত্বে সাশ্রয় হবে অতি সামান্য বা একেবারেই হবে না। দূরত্বের বিবেচনায় প্রায় সবগুলো করিডরই তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে।

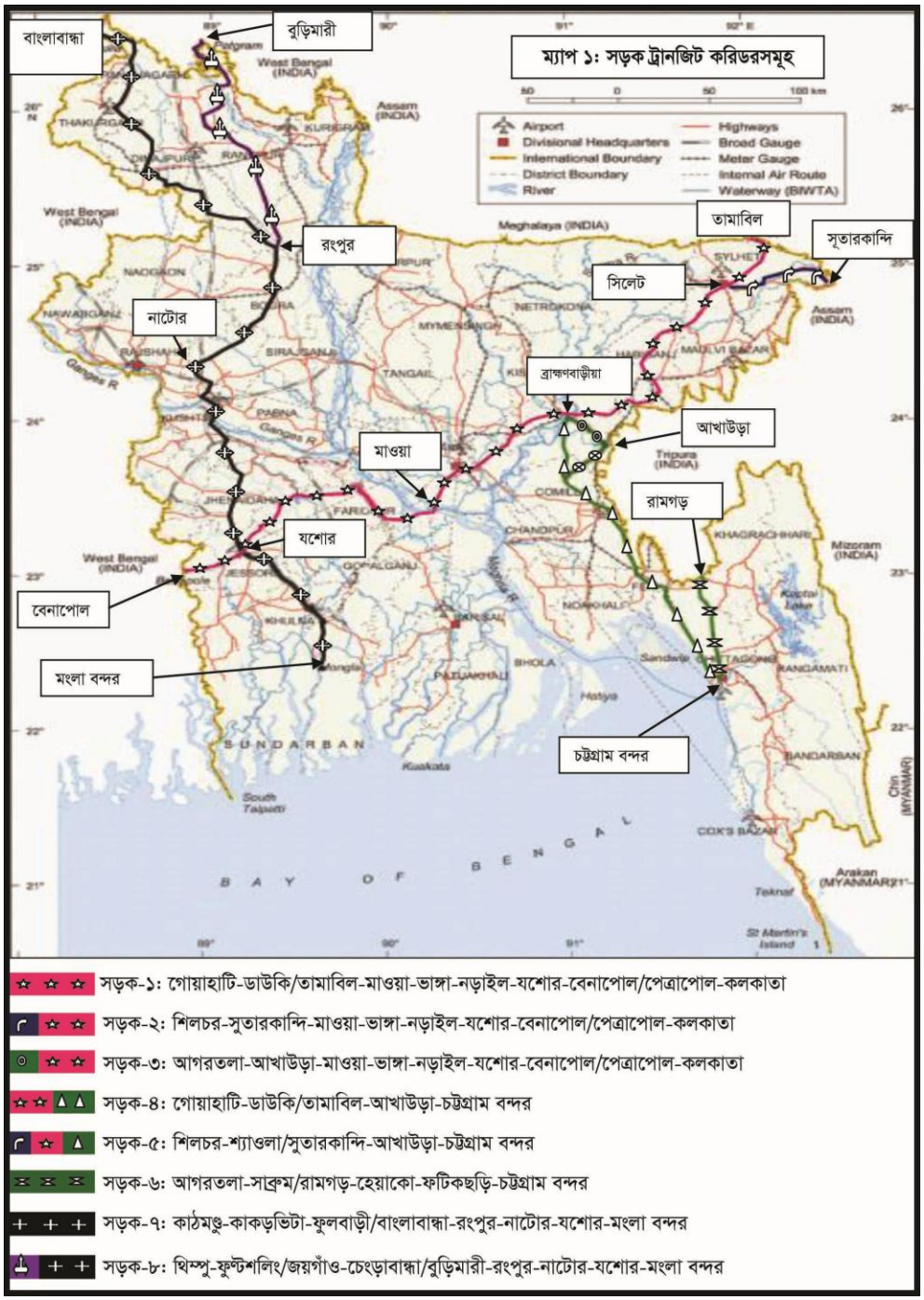
ম্যাপ ১: সড়ক ট্রানজিট করিডরসমূহ
বাংলাবান্ধা
বুড়িমারী
রংপুর
নাটোর
যশোর
বেনাপোল
মংলা বন্দর
মাওয়া
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
আখাউড়া
রামগড়
চট্টগ্রাম বন্দর
সিলেট
তামাবিল
সুতারকান্দি
Airport
Divisional Headquarters
International Boundary
District Boundary
River
Highways
Broad Gauge
Meter Gauge
International Air Route
Waterway (BIWTA)
সড়ক-১: গোয়াহাটি-ডাউকি/তামাবিল-মাওয়া-ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল/পেত্রাপোল-কলকাতা
সড়ক-২: শিলচর-সুতারকান্দি-মাওয়া-ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল/পেত্রাপোল-কলকাতা
সড়ক-৩: আগরতলা-আখাউড়া-মাওয়া-ভাঙ্গা-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল/পেত্রাপোল-কলকাতা
সড়ক-৪: গোয়াহাটি-ডাউকি/তামাবিল-আখাউড়া-চট্টগ্রাম বন্দর
সড়ক-৫: শিলচর-শ্যাওলা/সুতারকান্দি-আখাউড়া-চট্টগ্রাম বন্দর
সড়ক-৬: আগরতলা-সাব্রুম/রামগড়-হেয়াকো-ফটিকছড়ি-চট্টগ্রাম বন্দর
সড়ক-৭: কাঠমণ্ডু-কাকড়ভিটা-ফুলবাড়ী/বাংলাবান্ধা-রংপুর-নাটোর-যশোর-মংলা বন্দর
সড়ক-৮: থিম্পু-ফুন্টশলিং/জয়গাঁও-চেংড়াবান্ধা/বুড়িমারী-রংপুর-নাটোর-যশোর-মংলা বন্দর

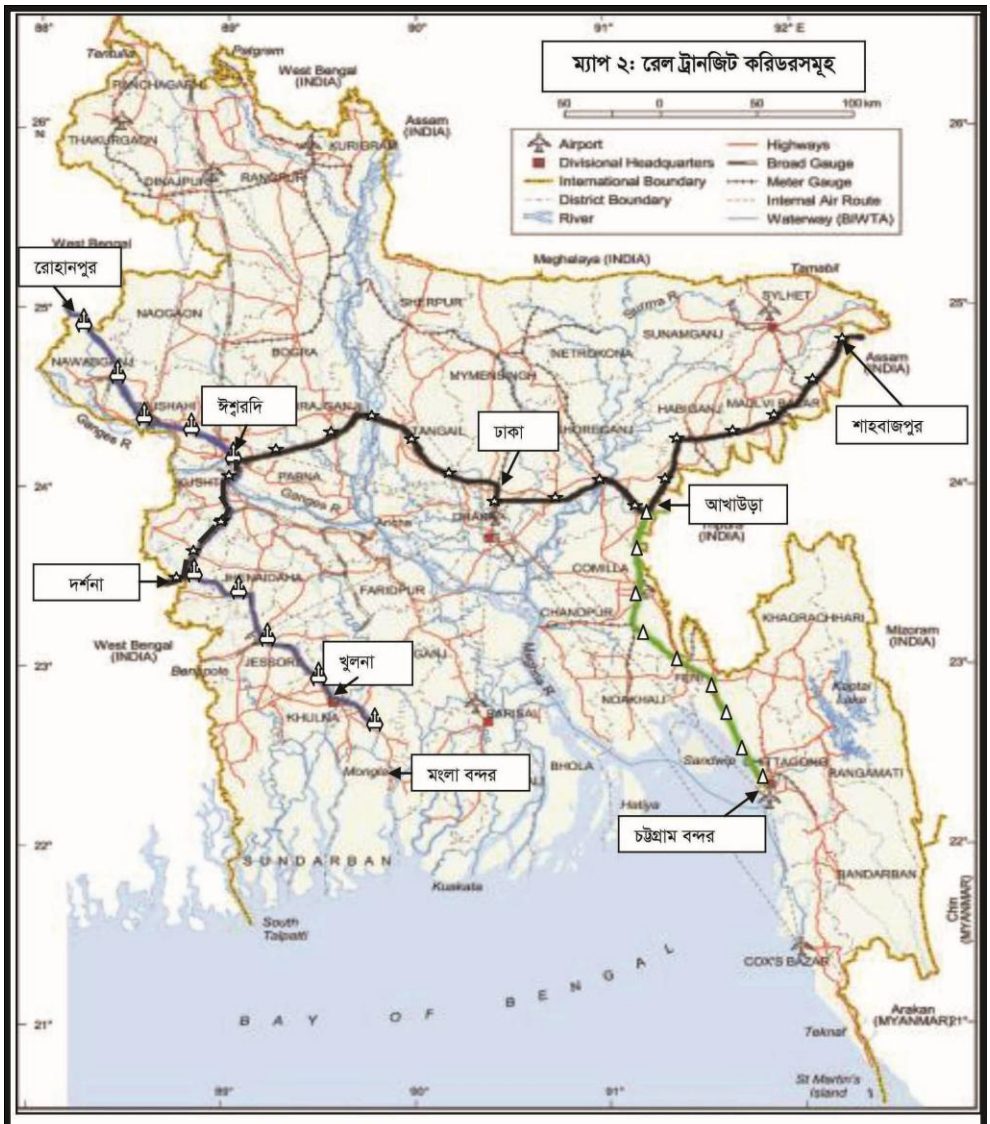
ম্যাপ ২: রেল ট্রানজিট করিডরসমূহ
রোহানপুর
ঈশ্বরদি
ঢাকা
শাহবাজপুর
আখাউড়া
দর্শনা
খুলনা
মংলা বন্দর
চট্টগ্রাম বন্দর
Airport
Divisional Headquarters
International Boundary
District Boundary
River
Highways
Broad Gauge
Meter Gauge
Internal Air Route
Waterway (BIWTA)
রেল-১: শিলচর-মাহিশসান/শাহবাজপুর-ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-দর্শনা/গেদে-কলকাতা
রেল-২: আগরতলা-আগরতলা/আখাউড়া-ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-দর্শনা/গেদে-কলকাতা
রেল-৩: শিলচর-মাহিশসান/শাহবাজপুর-আখাউড়া-চট্টগ্রাম বন্দর
রেল-৪: আগরতলা-আগরতলা/আখাউড়া-আখাউড়া-চট্টগ্রাম বন্দর
রেল-৫: বীরগঞ্জ-কাটিহার-সিঙ্গাবাদ/রোহানপুর-ঈশ্বরদি-খুলনা-মংলা বন্দর

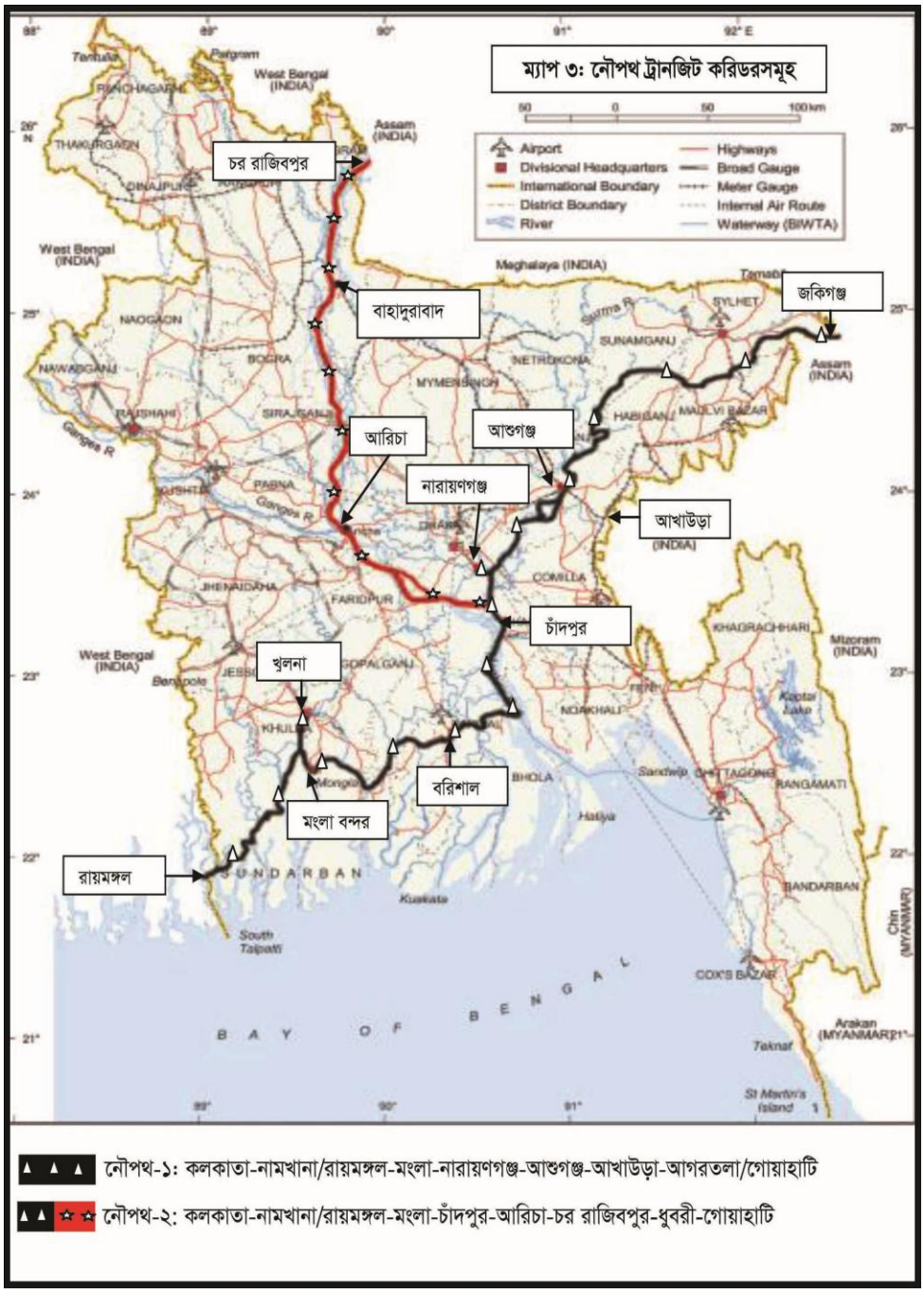
ম্যাপ ৩: নৌপথ ট্রানজিট করিডরসমূহ
চর রাজিবপুর
বাহাদুরাবাদ
আরিচা
নারায়ণগঞ্জ
আশুগঞ্জ
জকিগঞ্জ
আখাউড়া
চাঁদপুর
খুলনা
বরিশাল
মংলা বন্দর
রায়মঙ্গল
Airport
Divisional Headquarters
International Boundary
District Boundary
River
Highways
Broad Gauge
Meter Gauge
Internal Air Route
Waterway (BIWTA)
নৌপথ-১: কলকাতা-নামখানা/রায়মঙ্গল-মংলা-নারায়ণগঞ্জ-আশুগঞ্জ-আখাউড়া-আগরতলা/গোয়াহাটি
নৌপথ-২: কলকাতা-নামখানা/রায়মঙ্গল-মংলা-চাঁদপুর-আরিচা-চর রাজিবপুর-ধুবরী-গোয়াহাটি

রেল ট্রানজিট করিডরসমূহের ক্ষেত্রে একটি ছাড়া অন্য সব করিডরের অবস্থা প্রায় একই রকম। বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে চীন ও ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়া হলে ট্রানজিট ট্রেনগুলোকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার যাতায়াত করা প্রয়োজন হবে। যাতায়াতের ন্যূনতম দূরত্ব প্রদান করে রেল-৪, মাত্র ২১৩ কিলোমিটার। এ দূরত্বের প্রায় ৭০ শতাংশ আবার বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে মালবাহী ট্রেনগুলোকে বিদ্যমান করিডর দিয়ে ১,০০০ কিলোমিটারের বেশি যাতায়াত করতে হয়। সুতরাং ট্রানজিট সুবিধা পেলে ভারত ও চীনের যাতায়াত পথের দূরত্বের ৫০-৮৫ শতাংশ সাশ্রয় হবে। কলকাতা বন্দরে তীব্র জট থাকলে, দূরত্বের ক্ষেত্রের এ অসুবিধা হ্রাসপ্রাপ্ত যাতায়াত সময় ও পরিবহন ব্যয় দ্বারা পুষিয়ে যাবে। তখন নেপালের আন্তর্জাতিক পণ্য রেলপথে পরিবহন করাকে অধিক লাভজনক হিসেবে দেখার সম্ভাবনা রয়েছে। দূরত্ব অতিক্রমের বিবেচনায় নৌপথ-১ ট্রানজিট করিডর সুবিধাজনক বা লাভজনক হিসেবে দেখা গেছে।

নতুন ট্রানজিট করিডরসমূহ ব্যবহার করলে যাতায়াত সময়ে চীন এবং ভারত, ভুটান ও নেপালের উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় হবে। সারণি ১ এ প্রতিযোগী ও বিদ্যমান করিডরসমূহ দিয়ে পণ্য পরিবহনে ব্যয়িত মোট যাতায়াত সময় এবং প্রকৃত সাশ্রয়কৃত সময়ের পরিমাণ (যদি ট্রানজিট পণ্য বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে সড়ক, রেল ও নৌ ট্রানজিট করিডরের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়) দেখানো হয়েছে।

দেখা গেছে, সড়ক-৫ ছাড়া সবগুলো সড়ক ট্রানজিট করিডরে যাতায়াত সময়ের উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় হবে। সময় সাশ্রয়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১১১ ঘণ্টা (সড়ক-২) থেকে সর্বনিম্ন ৮ ঘণ্টা (সড়ক-৫) হতে পারে। সময়ের এ হ্রাস বোঝায় যে যাতায়াত সময়ে সাশ্রয় ৭৫ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশের কম হতে পারে। এভাবে ৮টি সড়ক ট্রানজিট করিডরের মধ্যে ৭টি করিডর যাতায়াত সময় হ্রাসের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা ভোগ করে; দূরত্ব হ্রাসের দিক দিয়ে ব্যাপক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও যাতায়াত সময় হ্রাসের দিক দিয়ে সড়ক-৫ খুব সামান্য সুবিধা ভোগ করে থাকে (সারণি ১)।

সারণি ১

প্রতিযোগী এবং বিদ্যমান ট্রানজিট করিডরসমূহের তুলনা

করিডর	দূরত্ব (কি.মি.)		সময় (ঘণ্টা)		মূল্য (মার্কিন ডলার/টন)	
	প্রতিযোগী	বিদ্যমান	প্রতিযোগী	বিদ্যমান	প্রতিযোগী	বিদ্যমান
			সড়ক ট্রানজিট করিডর			
সড়ক-১	৮২২ (৬৬)	১০৮১	৪৮.৫০	৭৬.০০	৩৪.৫৯	২৪.৮৬
সড়ক-২	৬৮৮ (৭৭)	১২৮৪	৩৫.৮০	১৪৭.০০	২৬.৫১	৩৮.৫২
সড়ক-৩	৪৭১ (৭৯)	১৬৮০	৩১.৫০	৭৫.০০	২৩.৮৪	৪২.০০
সড়ক-৪	৬৩০ (৭০)	১০৮১	২০১.০০	২৭২.৮০	৩৫.১৩	৩৯.১৭
সড়ক-৫	৪৯৩ (৮৬)	১২৮৪	১৮৯.৩০	১৯৬.৮০	২২.০৩	৪৬.৫৭
সড়ক-৬	২৫৩ (৯৭)	১৬৮০	১৮২.০০	২৭১.৮০	১৫.২৪	৫০.০৫
সড়ক-৭	১৩১৪(৫১)	১৩২৩	১৫৬.০০	২৪৯.৮০	৮৩.১০	১২১.৪৫
সড়ক-৮	৮৮০(৬৮)	১০৩৯	১৩৩.০০	২৩৮.৮০	২৫.২	২৭.৭৯

(চলমান সারণি ১)

করিডর	দূরত্ব (কি.মি.)		সময় (ঘণ্টা)		মূল্য (মার্কিন ডলার/টন)	
	প্রতিযোগী	বিদ্যমান	প্রতিযোগী	বিদ্যমান	প্রতিযোগী	বিদ্যমান
রেল ট্রানজিট করিডর						
রেল-১	৬৯২ (৭৪)	১৪৯৬	৩৭.৯	৪৩	২৩.৮০	৪৭.৮৭
রেল-২	৪৭৭ (৭৩)	১৬৮০	২৯.১	৭৫	১৯.২৬	৫৪.০০
রেল-৩	৪২৯ (৮৭)	১৪৯৬	১৭৮.৫	২৭১.৮	১৪.০২	৬২.০৫
রেল-৪	২১৩ (৯৫)	১৬৮০	১৮৯.৩	২৩৯.৮	১৮.৪৮	৫৬.১৩
রেল-৫	৯০৫(৪১)	৭০৪	১৩৭	২৪৯.৮	৩১.১২	২৭.৭৬
নৌপথ ট্রানজিট করিডর						
নৌপথ-১	৯৩৭ (৭১)	১৬৮০	১৫০.০	৭৫.০	২৫.৬১	৫০.০৮

উৎস: ইউনুস (২০১৩) থেকে গৃহীত।
নোট: (১) বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যাগুলো বাংলাদেশের মধ্যে থাকা করিডরগুলোর দৈর্ঘ্যের শতাংশ নির্দেশ করে। (২) 'চিকেন নেক' দিয়ে বিদ্যমান করিডর।

বিদ্যমান রেল ট্রানজিট করিডরসমূহের বিপরীতে প্রস্তাবিত রেল ট্রানজিট করিডরের সবগুলোই যাতায়াত সময় হ্রাসের দিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। প্রতিযোগী ট্রানজিট করিডরসমূহে যাতায়াত সময় সর্বনিম্ন ৩০ ঘণ্টা (রেল-২) থেকে সর্বোচ্চ ১৮৯ ঘণ্টা (রেল-৪)। পণ্য পরিবহন ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে এসব করিডরের অবস্থা নির্ভর করে তুলনামূলক পরিবহন খরচ ও মাসুলের উপর। নৌপথ-১ ট্রানজিট করিডরও একই রকম অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে।

মালামাল পরিবহন এক করিডরের পরিবর্তে অন্য করিডর দিয়ে পরিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তুলনামূলক পরিবহন খরচ। অন্য দুটো উপাদানের (সময় ও দূরত্ব) ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকা সত্ত্বেও খরচের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা থাকলে তা অন্য দুটো উপাদানের সুবিধাকে অতি দ্রুত নি:শেষ করে দেয়। প্রতিযোগী ও বিদ্যমান করিডরসমূহের মোট পরিবহন খরচ ও মাসুল সারণি ১ এ দেখানো হয়েছে।

আটটি সড়ক ট্রানজিট করিডরের মধ্যে সাতটি প্রতিযোগী করিডর স্ব স্ব বিদ্যমান করিডরগুলোর তুলনায় সুবিধা ভোগ করে। এই আটটি করিডরে পরিবহন খরচ ও মাসুল টন প্রতি ১৫ মার্কিন ডলার থেকে ৩৫ মার্কিন ডলার হিসাব করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বিদ্যমান এসব করিডরে বর্তমানে ব্যবসায়ীদেরকে টন প্রতি পরিবহন খরচ ও মাসুল হিসেবে ২৫ থেকে ৫০ মার্কিন ডলার করে দিতে হয়। ফলে টন প্রতি ১২ থেকে ৩৫ ডলার সাশ্রয় করা যায় বা বিদ্যমান পরিবহন খরচ ও মাসুলের ৩০-৭০ শতাংশ হ্রাস পায়। তবে বিদ্যমান করিডরের সাথে তুলনা করা হলে সড়ক-১ করিডর অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে (প্রতিযোগী করিডরে ৩৫ ডলার এবং বিদ্যমান করিডরে ২৫ ডলার)। এ করিডর দূরত্ব ও যাতায়াত সময় বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য সুবিধা ভোগ করলেও পরিবহন খরচ ও মাসুলের দিক দিয়ে এটি লাভজনক বা সাশ্রয়ী নয়।

একইভাবে পাঁচটি রেল ট্রানজিট করিডরের মধ্যে চারটি প্রতিযোগী করিডর বিদ্যমান করিডরের তুলনায় সাশ্রয়ী ও লাভজনক। এ চারটি করিডরের পরিবহন খরচ ও মাসুল টন প্রতি ১৪ থেকে ২৪ মার্কিন ডলার হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিদ্যমান এসব করিডরে বর্তমানে ব্যবসায়ীদেরকে ৪৮ থেকে ৬২

মার্কিন ডলার করে দিতে হয়। ফলে টন প্রতি ২৪ থেকে ৪৮ ডলার সাশ্রয় হবে। অন্য কথায় ব্যবসায়ীরা বর্তমান পরিবহন খরচ ও মাসুলের ৫০-৭০ শতাংশ সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে। বিদ্যমান করিডরের (রেলের মাধ্যমে) সাথে তুলনা করা হলে নৌপথ-১ ট্রানজিট করিডর উল্লেখযোগ্য সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট দেয়া হলে ও সে সুবিধা নেয়া হলে ব্যবসায়ীরা টন প্রতি প্রায় ২৪ ডলার বা বর্তমান পরিবহন খরচের ৫০ শতাংশ বা তার বেশি সাশ্রয় করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নব্বই দশকের শেষদিক পর্যন্ত ৯ বিলিয়ন রুপি ভরতুকি দিয়েছে, মোট পরিবহন খরচের প্রায় ২৫ শতাংশ ভরতুকি দেয়া হয় (ইসলাম, ২০০৮)। এই ভরতুকি প্রত্যাহার করা হলে বিদ্যমান করিডরসমূহের (সারণি ১) পরিবহন খরচ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি উপাদানের অর্থাৎ দূরত্ব, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের বিবেচনায় ১৪টি ট্রানজিট করিডরের মধ্যে ১২টি করিডরের ব্যবসায়ী ও পণ্য পরিবহনকারীরা সংক্ষিপ্ত ও সরাসরি কানেকটিভিটির কারণে পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ডাইভার্ট করাকে লাভজনক হিসেবে দেখতে পাবে। দূরত্ব ও পরিবহন খরচ এবং প্রতি টনে মাসুল অর্থে রেল-৫ এবং পরিবহন খরচ ও টন প্রতি মাসুলের দিক দিয়ে সড়ক-১ লাভজনক নয়। সুতরাং এ দুটো প্রতিযোগী করিডর বিষয়ে আর আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হবে না। তবে যাতায়াত সময়ের দিক দিয়ে সাশ্রয়ী না হলেও ভারত ও বিসিআইএম-এর প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে এবং পরিবহন খরচ ও মাসুলের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা থাকায় নৌপথ-১ ট্রানজিট করিডর বিষয়ে আরও আলোচনা করা হবে।

৫। বাংলাদেশের উপর দিয়ে পণ্য পরিবাহিত (ডাইভারশন) হওয়ার সম্ভাবনা

দেখা গেছে, ১২টি ট্রানজিট করিডর দিয়ে পণ্য পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা পণ্য পরিবহনের বিদ্যমান চলাচলের পরিমাণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। আকাশ, রেল ও নৌপথে বার্ষিক আন্ত:রাজ্য পণ্য পরিবহনের পরিমাণ প্রকাশনার উপর ভিত্তি করে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর আন্ত:রাজ্য পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ২০০৬-২০০৮ সালের জন্য হিসাব করা হয়েছে।[৭] কেবল রেলপথের মাধ্যমে আন্ত:রাজ্য পণ্য পরিবহনের জন্য সর্বশেষ বছরের ভিত্তি পরিমাণ হিসেবে নেয়া হয়েছে।[৮] আসাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ ব্যবহার করে থাকে। পক্ষান্তরে মনিপুর, মেঘালয় ও মিজোরামের রেলপথে অভ্যন্তরীণ ও আন্ত:রাজ্য পণ্য পরিবহনের পরিমাণ অতি নগণ্য। শেষত কাছাকাছি অবস্থান বা নৈকট্যতার ভিত্তিতে ফ্রেইট ট্রাফিক ডাইভারশনের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে অরুণাচল রাজ্যকে বিবেচনা করা হয়নি।[৯] যেহেতু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো স্থলবেষ্টিত এবং আকাশপথে পণ্য পরিবহন সুবিধা অনুন্নত, সেহেতু হিসাব করা হয়েছে যে আন্ত:রাজ্য পণ্য পরিবহনের ৩০ শতাংশ রেলে এবং অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ সড়ক পথে

---

[৭] ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড স্টাটিসটিকস, কলকাতা (২০০৮)। রেল, নৌ ও আকাশ পথে আন্ত:রাজ্য পণ্য চলাচল: ২০০৬, ২০০৭ ও ২০০৮।

[৮] বাস্তব কারণে আকাশ ও নৌপথকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

[৯] যেহেতু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য সব রাজ্যের চেয়ে অরুণাচল রাজ্য বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থিত এবং আসাম থেকে আংশিক ডাইভারশন হবে বলে ধারণা করা হয়েছে সেহেতু অরুণাচল রাজ্য থেকে কোনো পণ্য বাংলাদেশের উপর দিয়ে পরিবাহিত হবে না বলে ধরে নেয়া হয়েছে।

পরিচালিত হবে। এই অনুমান ভারতের গড় হিসাবের (২৮:৭২) কাছাকাছি।[১০] উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জন্য সড়ক, রেল ও নৌপথে পরিবাহিত পণ্যের অনুপাত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় উপাত্ত না থাকায় এই অতি সরলীকৃত অনুমান করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যদিও এতে সড়ক ও রেল পথে পণ্য পরিবহনের পরিমাপে কিছুটা বিচ্যুতি নিয়ে আসতে পারে।

রেল পথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কনটেইনার চলাচল সম্পর্কিত উপাত্ত সমন্বিত (aggregate) আকারে পাওয়া যায়।[১১] ফলে প্রথম ধাপে সমন্বিত উপাত্তকে বিশ্লিষ্ট (decompose) করার উদ্দেশ্যে অনুমান করা হয় পণ্যবাহী কনটেইনার পরিবহন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের অর্থনীতির আকারের সমানুপাতিক। দ্বিতীয় ধাপে রেল ও সড়ক পথে অনুমিত অনুপাত ৩০:৭০ ব্যবহার করে সড়ক পথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী কনটেইনার চলাচল বিষয়ক উপাত্তকে কেলিব্রেট করতে বিশ্লিষ্ট উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লিষ্ট উপাত্ত থেকে (সারণি ২) দেখা যায়, ভারতের অবশিষ্ট রাজ্যগুলো থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে প্রায় ৩৮.৫৪ মিলিয়ন টন পণ্য আনা-নেয়া হয়ে থাকে এবং একমাত্র আসাম থেকে আনা-নেয়া হয়ে থাকে ৩৪.৩৩ মিলিয়ন টন ও নাগাল্যান্ড থেকে ২.৩২ মিলিয়ন টন। কার্গো ফ্রেইট ট্রাফিক ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার টিইইউ কনটেইনার পরিবাহিত হয়ে থাকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও নেপালের জন্য প্রায় ৫২ হাজার টিইইউ কলকাতা বন্দর দিয়ে ওঠানামা হয়ে থাকে।

সারণি ২

ভুটান, নেপাল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং চীনের ইউনানের মোট পণ্য পরিবহন

রাজ্য/প্রদেশ/ দেশ	আন্তর্জাতিক		অভ্যন্তরীণ		মোট (টিইইউ)		
	টিইইউ	টন	টিইইউ	টন	আন্তর্জাতিক	অভ্যন্তরীণ	সর্বমোট
অরুণাচল	৭০১	৮৮,৪৭৭	৮১৭	১,৮৪,৫১৫	৬,৫৯৯	১৩,১১৮	১৯,৭১৭
আসাম	১২,২৬৭	১৩,৯৪,৬৬২	১০,০০৭	৩৪,৩৩,০৯৪১	১,০৫,২৪৫	২২,৯৮,৭৩৭	২৪,০৩,৯৮২
মনিপুর	১,০৩৪	১৩০,৫৭৭	১,২০৫	২,৭২,৩১৩	৯,৭৩৯	১৯,৩৫৯	২৯,০৯৯
মেঘালয়	১,৫২৪	১৯২,৪৫০	১,৭৭৬	৪,০১,৩৪৬	১৪,৩৫৪	২৮,৫৩৩	৪২,৮৮৭
মিজোরাম	৬৫১	৮২,১৮০	৭৫৯	২,৪৭,১৯৯	৬,১৩০	১৭,২৩৮	২৩,৩৬৮
নাগাল্যাণ্ড	১,৭৬৮	২০১,০০৮	১,৪৪২	২৩,১৭,৭৯১	১৫,১৬৯	১,৫৫,৯৬২	১,৭১,১৩০
ত্রিপুরা	২,৩২৮	২৬৪,৬৭১	১,৮৯৯	৭,৮৮,৫১৬	১৯,৯৭৩	৫৪,৪৬৭	৭৪,৪৪০
মোট ভারত	২০,২৭৩	২৩,৫৪,০২৫	১৭,৯০৬	৩,৮৫,৪২,৬২১	১,৭৭,২০৮	২৫,৮৭,৪১৪	২৭,৬৪,৬২২
ভূটান	-	৫৮,০০০	-	-	৩,৮৬৭	-	৩,৮৬৭
নেপাল	৩১,৭৬৫	৮৫৮,০০০	-	-	৮৮,৯৬৫	-	৮৮,৯৬৫
মোট ইউনান, পিআরসি	১,২৩,৫৫৮	৩০,২৯,৮৬২	-	-	৩,৭৬,০৪৭	-	৩,৭৬,০৪৭
সর্বমোট	১,৭৫,৫৯৬	৬২,৯৯,৮৮৭	১৭,৯০৬	৩,৮৫,৪২,৬২১	৬,৪৬,০৮৭	২৫,৮৭,৪১৪	৩২,৩৩,৫০১

উৎস: (১) ইউনুস (২০১৩) থেকে গৃহীত এবং (২) ইউএনএসকাপ (১৯৯৫) এর ভিত্তিতে ২০০৮-এর জন্য নির্ণীত।

[১০]দুর্বল রেল নেটওয়ার্কের কারণে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে রেলপথে পণ্য পরিবহনের পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও আসামের রেল কানেকটিভিটি বেশ ভালো এবং এবং রেলপথে পরিবাহিত মোট পণ্যের ৮০ শতাংশ আসাম দিয়ে হয়ে থাকে। সুতরাং রেলপথে পণ্য পরিবহনে আসামের প্রাধান্য থাকায় এ অনুমান যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

[১১]কনটেইনার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার সৌজন্যে আসামের আমিনগাঁও আইসিডির রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত।

রেলপথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আন্ত:রাজ্য পণ্য পরিবহনের তুলনায় আন্তর্জাতিক কার্গো ও কনটেইনার পরিবহনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কলকাতা বন্দর দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর প্রায় ২.৩৫ মিলিয়ন টন কার্গো আনা-নেয়া হয়ে থাকে, যার মধ্যে আসামের একার অবদান ১২.২৭ হাজার টিইইউ। ইউএনএসকাপ (১৯৯৫) অনুসরণ করে হিসাব করা হয়েছে যে, চীনের ইউনান ২০১০ সালে ৪.৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পণ্য আনা-নেয়া করে এবং এর মধ্যে ৩.০২ মিলিয়ন টন ছিল ব্রেক বাল্ক কার্গো এবং অবশিষ্ট ১.৮৪ মিলিয়ন টন ছিল কনটেইনার।

বাংলাদেশের উপর দিয়ে পরিবাহিত হওয়া সম্ভাব্য ট্রানজিট পণ্যের পরিমাণ সারণি ৩ এ দেখানো হয়েছে। উপরে উল্লেখিত করিডরসমূহের পর্যালোচনা থেকে অনুমান করা যায়, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে আসামমুখী (দক্ষিণ-পূর্বাংশ) বাণিজ্যের ৪৫ শতাংশ এবং মেঘালয়মুখী (পূর্বাংশ) বাণিজ্যের ৫০ শতাংশ বাংলাদেশের উপর দিয়ে সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সড়ক, রেল, অভ্যন্তরীণ নৌপথের লিংকের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে পুরোটাই বাংলাদেশের উপর দিয়ে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খরচের অসুবিধাজনিত কারণে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে মেঘালয় থেকে কলকাতায় এবং কলকাতা থেকে মেঘালয়ে সড়ক পথে পণ্য পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই (পরিশিষ্ট ১)।

সারণি ৩

ভুটান, নেপাল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং চীনের ইউনান থেকে পণ্যবাহী ট্রাফিকের সম্ভাব্য ডাইভারশন

রাজ্য/প্রদেশ/ দেশ	আন্তর্জাতিক		অভ্যন্তরীণ		মোট (টিইইউ)		
	টিইইউ	টন	টিইইউ	টন	আন্তর্জাতিক	অভ্যন্তরীণ	সর্বমোট
আসাম	৫,৫২০	৬,২৭,৫৯৮	৪,৫০৩	১,৩০,৪৫,৭৫৮	৪৭,৩৬০	৮,৭৪,২২১	৯,২১,৫৮১
মনিপুর	১,০৩৪	১,৩০,৫৭৭	১,২০৫	২,৭২,৩১৩	৯,৭৩৯	১৯,৩৫৯	২৯,০৯৯
মেঘালয়	৭৬২	৯৬,২২৫	-	-	৭,১৭৭	-	৭,১৭৭
মিজোরাম	৬৫১	৮২,১৮০	৭৫৯	২,৪৭,১৯৯	৬,১৩০	১৭,২৩৮	২৩,৩৬৮
নাগাল্যাণ্ড	১,৭৬৮	২,০১,০০৮	১,৪৪২	২৩,১৭,৭৯১	১৫,১৬৯	১,৫৫,৯৬২	১,৭১,১৩০
ত্রিপুরা	২,৩২৮	২,৬৪,৬৭১	১,৮৯৯	৭,৮৮,৫১৬	১৯,৯৭৩	৫৪,৪৬৭	৭৪,৪৪০
পশ্চিমবঙ্গ	১৩,৫৪৩	-	-	-	১৩,৫৪৩	-	১৩,৫৪৩
মোট ভারত	**২৫,৬০৬**	**১৪,০২,২৫৯**	**৯,৮০৮**	**১,৬৬,৭১,৫৭৭**	**১,১৯,০৯১**	**১১,২১,২৪৭**	**১২,৪০,৩৩৮**
ভুটান	-	**৫৮,০০০**	-	-	**৩,৮৬৭**	-	**৩,৮৬৭**
নেপাল	**১৫,৮৮৩**	**৪,২৯,০০০**	-	-	**৪৪,৪৮৩**	-	**৪৪,৪৮৩**
ইউনান, পিআরসি	**৬১,৭৭৯**	**১৫,১৪,৯৩১**	-	-	**১,৮৮,০২৩**	-	**১,৮৮,০২৩**
সর্বমোট	**১,০৩,২৬৮**	**৩৪,০৪,১৯০**	**৯,৮০৮**	**১,৬৬,৭১,৫৭৭**	**৩,৫৫,৪৬৪**	**১১,২১,২৪৭**	**১৪,৭৬,৭১১**

উৎস: প্রবন্ধে উল্লেখিত অনুমানের ভিত্তিতে লেখকের হিসাব।

ভুটান ও নেপালের বেলায়ও একই ধরনের ভৌগোলিক উপাদান প্রযোজ্য। ধারণা করা হয় যে, নেপালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পণ্যের ৫০ শতাংশ বাংলাদেশ দিয়ে পরিবাহিত হবে[১২] এবং ভুটানের ক্ষেত্রে পুরোটাই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হবে। প্রতিযোগী রেল করিডরের খরচজনিত অসুবিধার কারণে (বীরগঞ্জ-রোহানপুর-মংলা বন্দর এবং বীরগঞ্জ-রুক্সাল-কলকাতা বন্দর) নেপালের পণ্যের আংশিক ডাইভারশন সড়ক পথে হবে। আরও দেখা যায়, প্রতিযোগী বীরগঞ্জ-রোহানপুর-মংলা বন্দর দিয়ে টনপ্রতি খরচ বিদ্যমান করিডর বীরগঞ্জ-রুক্সাল-কলকাতা বন্দরের চেয়ে বেশি হবে। ফলে রেলপথে নেপালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পণ্য মংলা বন্দর দিয়ে পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

চীনের ইউনান থেকে একই ধরনের আংশিক ডাইভারশন ঘটতে পারে। ইউএনএসকাপ (১৯৯৫) এ বলা হয়েছে যে, ১৯৯৫ সালে ইউনানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পণ্যের ৪৩ শতাংশের উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল ছিল মিয়ানমার। যেহেতু চীন ও মিয়ানমারের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে, সেহেতু এটা ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত যে ২০১০ সাল নাগাদ মিয়ানমারের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়। উল্লেখ্য যে, চীনের মোট বাণিজ্যে ভারতের অংশ প্রায় ২ শতাংশ। যদি এই ভাগ ভারতের সঙ্গে ইউনানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আরোপ করা হয় তাহলে এ দুটো অঞ্চলের নৈকট্যের কারণে তা কম হবার সম্ভাবনা রয়েছে কেননা ভারতের সাথে ইউনানের নৈকট্যতা অধিক বাণিজ্য করার সুযোগ দিবে। সে অনুযায়ী অনুমান করা হয়েছে যে, ইউনানের আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যের ১০ শতাংশ বা প্রায় ৪৬০ হাজার মেট্রিক টনের উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল হবে ভারত। অবশিষ্ট ১.৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন হংকং ও গুয়াংচির ফেংচেংকে ব্যবহার করে বাংলাদেশ দিয়ে পরিবাহিত হতে পারে। কুনমিং ও হংকং এবং কুনমিং ও ফেংচেং এর মধ্যেকার দূরত্ব যথাক্রমে প্রায় ২,৪০০ ও ১,০০০ কিলোমিটার। হংকং যেহেতু অনেক দূরে অবস্থিত এবং ফেংচেং তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট সমুদ্র বন্দর সেহেতু ডাইভারশনের সুযোগ রয়েছে।

ভারতকে ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে কি পরিমাণ পণ্য পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (টিইইউ ও টন) তা সারণি ৩ এ দেখানো হয়েছে। দেখা যায়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো থেকে ১৬.৬৭ মিলিয়ন টন বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পরিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে আসাম থেকে ১৩.০৫ মিলিয়ন টন এবং নাগাল্যান্ড থেকে ২.৩২ মিলিয়ন টন আসবে। উপরে উল্লেখিত এ কার্গো ট্রাফ্রিক ছাড়াও ৯.৮ হাজার টিইইউ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আন্ত:রাজ্য কনটেইনার বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পরিবাহিত হবে। অন্তর্গামী ও বহির্গামী কনটেইনারের সংখ্যার দিক দিয়ে আসামের অবদান উল্লেখযোগ্য।

আন্ত:রাজ্য ফ্রেইট ট্রাফিকের তুলনায় মাত্র ২.৯১ মিলিয়ন টন আন্তর্জাতিক কার্গো বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হবে। এ ২.৯১ মিলিয়ন টনের মধ্যে ইউনান থেকে হবে ১.৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং আসাম থেকে হবে ০.৬৩ মিলিয়ন টন। অধিকন্তু বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ৭৪ হাজার টিইইউ পরিবাহিত হবে যার মধ্যে ৬২ হাজার হবে ইউনান থেকে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ হবে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে।

---

[১২]বাংলাবান্ধা-মংলা সড়ক ট্রানজিট করিডর দিয়ে নেপালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পণ্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক পণ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশের ডাইভারশন হবে।

বিভিন্ন ট্রানজিট করিডর দিয়ে পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্য ডাইভারশন পরিশিষ্ট ১ এ দেখানো হয়েছে। সড়ক, রেল ও নৌ পরিবহন সেবার বিদ্যমান সক্ষমতা ব্যবহারের পর্যায় থেকে ধারণা করা হয় যে, ট্রানজিট পণ্যের সিংহভাগ রেলপথে পরিচালিত হবে। সে অনুসারে এটা ধারণা করা হয় যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্তর্গামী ও বহির্গামী আন্ত:রাজ্য ফ্রেইট ট্রাফিকের ৭০ শতাংশ রেলপথে পরিবাহিত হবে এবং অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ সমহারে সড়ক ও নৌপথে পরিবাহিত হবে। এসব রাজ্যের আন্তর্জাতিক এবং ইউনানের আন্তর্জাতিক ফ্রেইট ট্রাফিকের ৮০ শতাংশ রেলপথে এবং অবশিষ্ট ২০ শতাংশ সড়কপথে পরিবাহিত হবে।

ভিত্তি বছরে ডাইভারশনের পণ্য পরিবহন আনবার পর ভবিষ্যতে প্রতি বছর ৮ শতাংশ বৃদ্ধি হিসাবে পণ্য পরিবহনের ডাইভারশন নির্ণয় করা হয়েছে। তবে এটিও নথিভুক্ত রয়েছে যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় শিল্পগুলো টেকসই নয় এবং শিল্পক্ষেত্রে বিস্তৃত হারে মন্দা রয়েছে (শকদেবা, ২০০৬; মিস্রা, ১৯৯১)। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের বেশির ভাগ অংশে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন আন্ডারগ্রাউন্ড দলকে চাঁদা দিতে হয় (মুর্শিদ, ২০১১)। এক্ষেত্রে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা ক্ষীণ ও হতাশাজনক। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোয় তুলনামূলক স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করায় আতংকিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। উপরন্তু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই (পেডিকো, ২০১৪)।

৬। অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধাদির জন্য বাংলাদেশের ব্যয়

পণ্যবাহী যানের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়ার সাথে সাথে নতুন অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধাদি তৈরি এবং বিদ্যমান অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধাদির উন্নয়নে বাংলাদেশকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হবে।[১৩] এই খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত হবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়। বিভিন্ন ট্রানজিট করিডর দিয়ে ট্রানজিট পণ্য পরিবাহিত হওয়ার পরিমাণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহনের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এজন্য আনুপাতিক মূলধনী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ট্রানজিট ট্রাফিকের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।[১৪] অধিকন্তু মূলধনী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের দ্বৈত গণনা (double counting) পরিহার করার জন্য যেসব ট্রানজিট করিডরে ওভারলেপিং হয় সেখানে ট্রানজিটের আগের ও পরের অংশের ব্যয় আলাদা করে সে সম্ভাবনা দূর করা হয়েছে।

বিভিন্ন ট্রানজিট পয়েন্টে কিছু মৌলিক বা প্রাথমিক ভৌত সুবিধাদি গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং পণ্যবাহী ট্রানজিট যান তল্লাশি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কনটেইনার/কাভার্ড ভ্যান সিলগালা করার (বাংলাদেশ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক) জন্য ওয়ান স্টপ ক্লিয়ারেন্স সুবিধাদি গড়ে তুলতে হবে। যানবাহন বহির্গমনের সময় একই কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে (যেমন বলা

[১৩]ভুটান, ভারত, মিয়ানমার, নেপাল ও চীনের দিক থেকে একই ধরনের বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এ সমীক্ষায় যেহেতু বাংলাদেশের উপর ফোকাস করা হয়েছে সেহেতু এসব দেশের ব্যয়ের প্রাক্কলন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

[১৪]যেহেতু বাংলাদেশ তার উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে সেহেতু পুরো ব্যয়কে নয় বরং মূলধনী ব্যয়ের একটা অংশকে বর্তমান বিশ্লেষণে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

যায় সিল ও কাগজপত্র যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে) ট্রানজিট ট্রাফিকের অনুমতি দিতে পারে। এ ধরনের সুবিধাদি সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে ট্রানজিট প্রদানকারী দেশগুলোকে (বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার) মূলধনী এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ বহন করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য এরূপ খরচের হিসাব করা হয়েছে।

ভুটান, নেপাল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও চীনের ইউনান থেকে সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে সড়ক, রেল ও বন্দর অবকাঠামো এবং সীমান্ত পারাপার সুবিধাদি উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। সারণি ৪ এ সড়ক খাতের জন্য মূলধনী ব্যয় হিসাব করা হয়েছে। সড়ক, বন্দর ও স্থলবন্দর অবকাঠামো ও সুবিধাদির উন্নয়ন ও নির্মাণে মোট ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে। এই বিনিয়োগের প্রায় ১২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ট্রানজিট করিডরসমূহের বিভিন্ন অংশের ট্রানজিট সুবিধাদির জন্য আনুপাতিক হারে ভাগ করা হয়েছে।[১৫] এই ১২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ৫টি ট্রানজিট করিডরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশের পুনর্বাসনে প্রয়োজন হবে। চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তামাবিল, আখাউড়া, সুতারকান্দি ও বেনাপোল স্থল বন্দরের উন্নয়নে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে।

এটা ধারণা করা হয় যে, ট্রানজিট সুবিধা চালুর ৫ বছরের মধ্যে এ বিপুল খরচ বাংলাদেশকে বহন করতে হবে। এ ছাড়া সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বাংলাদেশকে প্রতি বছর ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করে ২০ বছর ধরে ব্যয় করতে হবে। ভবিষ্যতে পণ্যবাহী যানের বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে সড়কের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় মূলধনী ব্যয়ের ১০ শতাংশ হারে ধরা হয়েছে, যা করিডরসমূহের অবকাঠামো ও সুবিধাদির ক্ষয়ক্ষতির কারণে বৃদ্ধি পেতে পারে। রেল ও নৌপথের জন্য মূলধনী ব্যয়ের ৫ শতাংশ হারে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসব ব্যয় অভ্যন্তরীণ ট্রাফিক ও ডাইভারটেড ট্রাফিকের মধ্যে আনুপাতিক হারে ভাগ করা হয়েছে। যেখানে ডাইভারটেড ট্রাফিকের জন্য নতুন সুবিধাদি সৃষ্টি করা দরকার হবে সেখানে ডাইভারটেড ট্রাফিকের উপর সম্পূর্ণ ব্যয় আরোপ করা হয়েছে। অধিকন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যয় আনুপাতিক হারে ভাগ করা হয়েছে: প্রথম ধাপে অভ্যন্তরীণ ও ডাইভারটেড ফ্রেইট ট্রাফিকের উপর ভিত্তি করে এবং দ্বিতীয় ধাপে সড়ক ও রেল কর্তৃক পরিবাহিত তুলনামূলক ট্রাফিকের উপর ভিত্তি করে।

রেল ট্রানজিট করিডরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রথম ৫ বছরে বাংলাদেশকে প্রায় ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে (সারণি ৪)। এ অর্থের মধ্যে কমপক্ষে ৪টি করিডরে ট্রানজিট ফ্রেইট ট্রাফিকের জন্য দরকার হবে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের ট্রানজিট ট্রাফিকের দক্ষতা উন্নয়নে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার হবে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে ডাইভারটেড ট্রাফিকের অর্থাৎ বাংলাদেশের উপর দিয়ে পণ্য পরিবাহিত হওয়ার সুবিধা পেতে ২০ বছর ধরে প্রতি বছর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে। এ উদ্দেশ্য বাস্তব রূপ দিতে ডাইভারটেড

[১৫]সড়ক-১ (তামাবিল-বেনাপোল) করিডরকে লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি যেহেতু এটাকে বিদ্যমান করিডরের তুলনায় অলাভজনক হিসেবে দেখতে পাওয়া গেছে। সুতরাং ব্যয়ের পরিমাপ থেকেও করিডরটিকে বাদ দেয়া হয়েছে।

ফ্রেইট ট্রাফিক পরিবহনের সুবিধার্থে ব্রডগেজ ও মিটারগেজ ট্র্যাকের জন্য লোকোমোটিভ, ফ্লাট কার, ওয়াগন, ব্রেক ভ্যান ইত্যাদি সংগ্রহ করা প্রয়োজন হবে। বিবেচনাধীন সময়কালে রেলপথে প্রচুর পরিমাণ পণ্য ও মালামাল পরিবাহিত হবে সে বিবেচনায় রেল খাতে উচ্চ ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

সারণি ৪

ট্রানজিট করিডরের জন্য মূলধন ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সড়ক ট্রানজিট করিডরসমূহ					
করিডর	সড়কের/রেলের অংশ	চট্টগ্রাম বন্দর	মংলা বন্দর	স্থল বন্দর	মোট
সড়ক-২	৩২.৬৫	-	-	৭.২৭	৩৯.৯২
সড়ক-৩	৬.৫৭	-	-	৬.০২	১২.৫৮
সড়ক-৪	১০.৭৫	৯.৪৭	-	৩.৯৩	২৪.১৫
সড়ক-৫	২০.৪৩	১৭.৯২	-	০.৩৩	৩৮.৬৮
সড়ক-৬	৫.৬৩	৫.২৭	-	২.১১	১৩.০২
সড়ক-৭	২৩.৯৭	-	১৫১.৫৯	৩.৯৩	১৭৯.৪৯
সড়ক-৮	৪.০৬	-	১৩.১৭	৩.৯৩	২১.১৬
ট্রানজিটের আনুপাতিক ব্যয়	১০৪.০৬	৩২.৬৭	১৬৪.৭৬	২৭.৫২	৩২৯.০১
মোট ব্যয়	১৫৪৩.৯০	৩২৬.৫৭	৩৯৬.৮৩	২৭.৫১	২২৯৪.৮০
রেল ট্রানজিট করিডরসমূহ					
রেল-১	১২৬৯.১৮	-	-	-	১২৬৯.১৮
রেল-২	৭৮.৮২	-	-	-	৭৮.৮২
রেল-৩	১৪৯.৮৬	৭৯.৮৭	-	-	২২৯.৭৩
রেল-৪	৩৯.৯২	২০.৩৫	-	-	৬০.২৮
ট্রানজিটের আনুপাতিক ব্যয়	১৫৩৭.৭৯	১০০.২২	-	-	১৬৩৮.০২
মোট ব্যয়	২৭৪০.১৫	৩২৬.৫৭	-	-	৩০৬৬.৭১
নৌপথ ট্রানজিট করিডর					
হাইড্রলিক সার্ভে ও ড্রেজিং					৩৫.৬৯
রায়মঙ্গল-মংলা সেকশন					৯.৮৯
ভবানীর চরের নিকটে ও মংলা ও ঘাসিয়াখালীর মধ্যেকার বিভিন্ন হট স্পট					২৫.৭৯
রাত্রিকালীন নৌযান চলাচলের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংস্থাপন					১.১০
আশুগঞ্জে নৌ বন্দর ও আধুনিক ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা সংস্থাপন					১৪.৪৬
আখাউড়া স্থল বন্দর					৩.৯৩
ট্রানজিটের আনুপাতিক ব্যয়/মোট ব্যয়					৫৫.১৮

উৎস: ইউনুস (২০১৩) থেকে গৃহীত।

নোট: ওভারল্যাপিং অংশের খরচ ওভারল্যাপিং করিডরের অংশের সমানুপাতে করা হয়েছে।

নৌপথ-১ (রায়মঙ্গল-আশুগঞ্জ) করিডরের জন্য রায়মঙ্গল-মংলা সেকশনে এবং ভবানীর চরের নিকটে ও মংলা ও ঘাসিয়াখালীর মধ্যেকার বিভিন্ন হট স্পটে হাইড্রলিক সার্ভে ও ড্রেজিং করা প্রয়োজন হবে। এছাড়া করিডর দিয়ে রাত্রিকালীন নৌযান চলাচলের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংস্থাপন প্রয়োজন হবে। ফলে ট্রানজিট কার্গো হ্যান্ডলিং করতে আশুগঞ্জকে আধুনিক ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধাদি সম্পন্ন পূর্ণ নৌ বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এসব কাজের জন্য ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ ছাড়াও আখাউড়া স্থল বন্দরের জন্য অতিরিক্ত ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার হবে (সারণি ৪)। এসব কাজ সম্পন্ন করতে কমপক্ষে ৫ বছর লেগে যেতে পারে। পানির অব্যাহত প্রবাহের বিবেচনায় যেহেতু নৌপথ করিডরের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় ন্যূনতম হয় সেহেতু এক্ষেত্রে মূলধনী ব্যয়ের ৫ শতাংশ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ধরা হয়েছে। এর মানে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বছরে প্রায় ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার হবে।

বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পূর্ণমাত্রার ও দক্ষ ট্রানজিট ব্যবস্থার বাস্তবায়নে প্রয়োজন সড়ক, রেল ও নৌপথে অগ্রাধিকার প্রকল্পভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যয়। যেহেতু এসব ব্যয়ের প্রাক্কলন ২০১০ সালের মূল্যে করা হয়েছে এবং যেহেতু ২০১৪ সালের জন্য লাভের অংক হিসাব করা হয়েছে, সেহেতু ব্যয় বৃদ্ধির হার বছরে ৫ শতাংশ ধরে নিম্নের লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭। বাংলাদেশ যেসব মাসুল, ফি ও চার্জ আরোপ করতে পারে

ট্রানজিটের স্বাধীনতা ধারণা অনুসারে ট্রানজিট পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কোনোভাবে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব বা বাধা সৃষ্টি করা যাবে না এবং কাস্টমস শুল্ক ও সকল প্রকার ট্রানজিট শুল্ক বা অন্য ধরনের মাসুল আরোপ করা যাবে না (ধারা ৫, অনুচ্ছেদ ২, গ্যাট ১৯৯৪)। তবে ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যয় বা সেবা প্রদানের খরচ বাবদ যুক্তিসঙ্গত মাসুল আরোপ করা যাবে। ট্রানজিটের জন্য সুবিধাদি ও অবকাঠামো তৈরি ও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ খরচ বাংলাদেশকে পরিপূরণ করতে হবে। সুতরাং সড়ক, রেল ও নৌপথের জন্য ট্রানজিট মাসুল নিউবেরি (১৯৮৮) অনুসরণ করে ধার্য করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ভুটান, চীন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও নেপাল পণ্য আনা-নেয়া ও তাদের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর আন্ত:রাজ্য পণ্য পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ ভূখণ্ড ব্যবহার করতে পারবে বিধায় বাংলাদেশ ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে আয় করার সুযোগ পাবে। প্রথমত, সড়ক পরিবহন ব্যবসায়ী, নৌযান পরিচালনাকারী ও বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিবহন মাসুল বাবদ আয়। দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বন্দর মাসুলসমূহ (আমদানি ও রপ্তানির উপর আরোপিত কাস্টমস ও সম্পর্কিত চার্জসমূহ ব্যতীত)। তৃতীয়ত, স্থল বন্দর/স্থল কাস্টমস স্টেশনসমূহে ট্রানজিট সেবা সহায়তা প্রদানের জন্য মাসুল। চতুর্থত, প্রধান প্রধান সেতুর যেমন যমুনা বা পদ্মা সেতু (যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হলে) উপর দিয়ে যান চলাচলের জন্য টোল ও ফেরী পারাপারের জন্য মাসুল/ফি। পঞ্চমত, অবকাঠামো ক্ষতিবাবদ ব্যয় (সড়ক, রেল, নৌপথ, বন্দর ও সীমান্ত অতিক্রম/বর্ডার ক্রসিং); কনজেশন (সড়কে যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ) ব্যয় (সড়ক); দুর্ঘটনা (সড়ক) এবং পরিবেশগত দূষণ (সড়ক ও নৌপথ) ইত্যাদির জন্য মাসুল/ফি আরোপ থেকে আয়।

বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের জন্য বাংলাদেশের সড়ক, রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ অবকাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের খরচ আরোপ হবে। এসব কতিপয় খরচ হলো অবকাঠামোর ক্ষতি, কনজেশন, দুর্ঘটনা, পরিবেশগত দূষণ খরচ (সড়ক খাতের জন্য দেখুন নিউবেরি, ১৯৮৮)। এছাড়া রয়েছে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ব্যয়, ট্রানজিট পণ্যের নিরাপত্তা খরচ, কাস্টমস সেবা ইত্যাদি। উপ-আঞ্চলিক ট্রানজিটের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি জাতীয় কমিটি বিশ্বের উত্তম প্র্যাকটিস ব্যবহার করে ট্রানজিট যানবাহনের উপর ন্যূনতম হারে মাসুল আরোপের সুপারিশ করে: সড়ক পথে প্রতি টন পণ্য পরিবহনে কিলোমিটার প্রতি ৮.৯৬ সেন্ট, রেলপথে ৩.৮৪ সেন্ট এবং নৌপথে ৩.২০ সেন্ট (ইউনুস, ২০১৩)। এসব হার এ বিশ্লেষণেও ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিবহন মাসুল থেকে সুবিধা পরিমাপে ধারণা করা হয় যে করিডরের প্রতিটা দেশ তার অন্তর্ভুক্ত অংশের পরিবহন মাসুলের সুবিধা লাভের অধিকারী হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ট্রাক কলকাতা থেকে আগরতলায় পণ্য পরিবহন করে নিয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশ পরিবহন মাসুল/ফি এর সুবিধা পাবে বেনাপোল থেকে আখাউড়া পর্যন্ত এবং ভারত পাবে পেত্রাপোল থেকে কলকাতা এবং আখাউড়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত পরিবহন মাসুলের সুবিধা। এ অনুমান সব ট্রান্সপোর্ট করিডর ও সব ধরনের পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। বন্দর মাসুল পরিমাপে অনুমান করা হয়েছে যে বাংলাদেশ ট্রানজিট কনটেইনার/কার্গোর উপর বৈষম্যহীন মাসুল আরোপ করবে। আরও অনুমান করা হয়েছে যে, ডাইভারটেড পণ্যের ১৫ শতাংশ সড়ক ট্রানজিট করিডরসমূহ দিয়ে পরিবাহিত হবে এবং নৌপথেও সড়ক ট্রানজিটের অনুরূপ পরিমাণ পণ্য পরিবাহিত হবে। ডাইভারটেড পণ্যের অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ মোট ডাইভারটেড ফ্রেইট ট্রাফিকের ৭০ শতাংশ রেল ট্রানজিট করিডরসমূহ দিয়ে পরিবাহিত হবে।

উপরে উল্লেখিত এসব সুবিধা ডাইভারটেড ফ্রেইটের ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়েছে। এটা ধারণা করা হয়েছে যে, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে প্রতিটাতে সম্ভাব্য ডাইভারটেড ফ্রেইট ট্রাফিকের ১০ শতাংশ পরিবহন করবে স্ব স্ব ট্রানজিট করিডর এবং ষষ্ঠ বছর থেকে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা বাড়াতে পারবে। সুবিধাদির কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় নিয়ে প্রথম ৫ বছরে ট্রানজিট ফ্রেইটের পরিমাণ কম নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম ৫ বছরে মোট বার্ষিক আয় হবে প্রায় ৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যখন সব পরিকল্পিত অবকাঠামোগত সুবিধাদি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হবে তখন মোট আয় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি দাঁড়াবে।

৮। ট্রানজিটে বাংলাদেশের আর্থিক লাভ-ক্ষতি

ব্যয়ের সাথে সুবিধাকে কিভাবে তুলনা করা হয় তার উপর নির্ভর করে জাতীয় অর্থনীতিতে ট্রানজিটের প্রভাব। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নীট লাভ (নীট বেনিফিট) নিরূপণ করার জন্য প্রথম ধাপে রেল, সড়ক, নৌপথ করিডরসমূহ পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে সকল সড়ক ও রেল ট্রানজিটকে একত্রে সকল সড়ক ও সকল রেল ট্রানজিট হিসেবে নেয়া হয়েছে। তৃতীয় ধাপে তিন ধরনের ট্রানজিট করিডরের সবগুলোকে একত্র করে সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির হিসাব করা হয়েছে। বিশ্লেষণের ফলাফল ট্রানজিট করিডর এবং গ্রুপ ও সামগ্রিক ভেদে পরিশিষ্ট ২ এ দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৫টি সড়ক ট্রানজিটের সবগুলোই, ৪টি রেল ট্রানজিটের সবগুলোই এবং নৌপথ-১ ট্রানজিট

করিডর অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। এসব ট্রানজিট করিডরের আইআরআর (ইন্টারন্যাল রেট অব রিটার্ণ) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত মূলধনের সুযোগ ব্যয়ের চেয়ে অনেক উপরে (১২ শতাংশ)।[১৬] যাহোক প্রকৃত সুবিধার দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বশেষ কলামে উল্লেখিত র‍্যাংক অনুসরণ করে এসব ট্রানজিট করিডরের উন্নয়ন করা সরকারের জন্য যুক্তিযুক্ত হবে।

আর্থিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিবেচনায় তিন ধরনের ট্রানজিট করিডরের পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। যেহেতু সকল সড়ক ট্রানজিট করিডর এবং সকল রেল ট্রানজিট করিডর একত্রে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক সেহেতু সরকার তিন ধরনের ট্রানজিট করিডরের নীট বর্তমান মূল্যকে (নীট প্রেজেন্ট ভ্যালু) বিবেচনায় নিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে প্রথমে রেল ট্রানজিট করিডর তারপরে যথাক্রমে সড়ক ট্রানজিট করিডর ও নৌপথ ট্রানজিট করিডরের উন্নয়ন করতে পারে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা না থাকলে সরকার একসঙ্গে সবগুলো ট্রানজিট করিডরের উন্নয়ন করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সামগ্রিক লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণ পরিচালনা করা হয়েছে। পরিশিষ্ট ২ এর সর্বশেষ প্যানেলে প্রদত্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, ট্রানজিট সুবিধা দেয়া বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে একটি লাভজনক বিষয়। সামগ্রিক বিশ্লেষণের আইআরআর (৫০.৬১ শতাংশ) লাভজনকতা নির্ধারণে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত মূলধনের সুযোগ ব্যয়ের চেয়ে অনেক উপরে। লাভ-ক্ষতির অনুপাত হলো ৭.১০, যা ১ এর চেয়ে অনেক বেশি। শেষত নীট বর্তমান মূল্য হলো ১০.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিনিয়োগের যথার্থতা নির্দেশ করে।

উপরোক্ত অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও ট্রানজিট করিডরসমূহ এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক সুবিধা নিয়ে আসবে। এসব সুবিধাকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ট্রানজিট করিডরসমূহ কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে যেহেতু বিনিয়োগ অধিকতর প্রতিযোগীতাপূর্ণ হবে, সেহেতু বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা তাদের ব্যবসার মডেল বা ধরনে পরিবর্তন আনবে বা সামঞ্জস্য বিধান করবে। এছাড়া পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে পরিণত হবে এবং আঞ্চলিক সরবরাহ চেইনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে; (২) যেহেতু অন্য অঞ্চলের নতুন করিডরসমূহ বিদ্যমান ট্রানজিট করিডরসমূহ থেকে সুবিধা পেতে শুরু করবে, ট্রানজিট করিডরসমূহ আঞ্চলিক নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে সাথে নেটওয়ার্কজনিত অতিরিক্ত সুবিধা লাভের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিবে; (৩) ট্রানজিট করিডরসমূহের উন্নয়ন, নির্মাণ ও পুনর্গঠনে প্রাথমিক সরকারি বিনিয়োগ আবশ্যকীয় সহায়ক (ancillary) কর্মকাণ্ডে বেসরকারি বিনিয়োগকে (যেমন স্টোরেজ সুবিধাদি ও অন্যান্য লজিস্টিক উন্নয়ন, ফিডার ট্রান্সপোর্ট সংযোগকারী পয়েন্ট ইত্যাদি) উৎসাহিত করবে যা পূর্বে লাভজনক ও বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় ছিল না; এবং (৪) ট্রানজিট ব্যবসার সুযোগ ও প্রসার ঘটবে, ব্যবসা কেন্দ্রীক যাতায়াত বৃদ্ধি পাবে এবং বেকার যুবক ও ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

[১৬]বাংলাদেশের সরকার অর্থায়িত প্রকল্পসমূহের ডিসকাউন্টিং এ ১২ শতাংশ হার সাধারণত প্রয়োগ হয়ে থাকে।

৯। ট্রানজিট সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়

বর্ডার প্রক্রিয়া: কাস্টমস স্টেশন ও স্থল বন্দরসমূহ দক্ষ, দ্রুত ও কম ব্যয়সাপেক্ষ হবে এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতে বিদ্যমান করিডরসমূহের তুলনায় প্রতিযোগী ট্রানজিট করিডরসমূহ তুলনামূলক সুবিধা ভোগ করে। এসব অনুমান কেবল তখনই যথার্থ হবে যখন ট্রাক কোম্পানি, যানবাহন ও গাড়ী চালকদের জন্য পূর্বনিবন্ধনের (pre-registration) ব্যবস্থা থাকে এবং বর্ডার কার্যক্রম কেবল চেকিং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এরূপ পূর্বনিবন্ধনের সাথে সম্মত বীমা নোট বা প্রত্যয়নপত্র থাকবে। বাংলাদেশে ১০ টনের এক্সেল লোডিং চলাচলের যে নিয়ম আছে পণ্যবাহী যানগুলো তা মেনে চলে কিনা সেজন্য যানবাহনগুলো চেক করতে হবে। এছাড়া যানবাহনের লোড টেম্পারপ্রুফ সিলসহ বাংলাদেশ কাস্টমস কর্তৃক যানবাহন আগমন ও নির্গমনের সময় যথাক্রমে সিলগালা ও সিলগালামুক্ত করতে হবে। স্বাভাবিক আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে আরবিট্রেজ নিরুৎসাহিত করতে বন্ডের মূল্যমান (লেভেল) অর্থদণ্ডের ভিত্তিতে হিসাব করতে হবে। যানবাহনের গায়ে লাগানো সিল অক্ষত না থাকলে বা অন্য কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে বন্ড বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

জ্বালানিতে ভর্তুকি: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভর্তুকির কারণে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে ডিজেলের দাম সাধারণত সস্তা থাকে। দামের এ পার্থক্যের কারণে সড়ক ও নৌপথ ট্রানজিটে যানবাহনের চালকদের কর্তৃক আরবিট্রেজ উৎসাহিত করবে - যানবাহনগুলো বাংলাদেশে জ্বালানি শূন্য হয়ে ঢুকবে এবং জ্বালানি পূর্ণ হয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করবে। এরূপ কর্মকাণ্ড যানবাহনের চালকদের জন্য কিছুটা যুক্তিযুক্ত হলেও এর ফলে জ্বালানি তেলে প্রদত্ত বাংলাদেশের সাবসিডি ভারতে লিকেজ হয়ে যাবে। যেহেতু যেসব ট্রানজিট পণ্যবাহী যান বাংলাদেশের পেট্রোল স্টেশন থেকে জ্বালানি নিবে কেবল সেসব যান জ্বালানি তেলের ভরতুকির সুবিধা পাবে সেহেতু এটিকে ট্রানজিট মাসুলের আওতার বাইরে রাখতে হবে এবং নির্দিষ্ট বিক্রয় কেন্দ্রে আলাদাভাবে আদায় করতে হবে।[১৭]

এছাড়া সীমান্ত অবস্থার উন্নয়নে অনেক সুপারিশ করা হয়েছে যা হলো ট্রানজিট দেশসমূহের পণ্যবাহী ট্রাকের আন্ত:সীমান্ত যাতায়াতের পরীক্ষামূলক প্রবর্তন: যেমন বাংলাদেশের কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরে ভারতীয় ট্রাকের এবং ভারতের কয়েকটি নির্দিষ্ট শহরে বাংলাদেশের ট্রাকের যাতায়াতের সুযোগ দেয়া, কাস্টমস তল্লাশি, পরিদর্শন ও তদারকি সময়ের সমন্বয়সাধন ইত্যাদি। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো কাস্টমস পজিশনিং, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, মানসম্মত বিক্রয় কর পদ্ধতি, কর্মদিবস ও কর্মঘন্টার সুসঙ্গতিকরণ, বীমা ও ব্যাংক সেবা (পেডিকো, ২০০৯)।

১০। উপসংহার ও এগিয়ে যাওয়ার উপায়

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, ভুটান, নেপাল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও চীনের ইউনান থেকে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য পরিবাহিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কার্গো ও কনটেইনার বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা পেলে দূরত্ব, যাতায়াত সময় ও

[১৭]এখানে উল্লেখ্য যে, ইউরোপের অনেক দেশ ট্রানজিট যানবাহনের উপর জ্বালানি কর (এক ধরনের বিক্রয় কর/আবগারী শুল্ক) আরোপ করে।

পরিবহন খরচের উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় হবে। এর ফলে ট্রানজিট ব্যবহারকারী দেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের জন্য বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করা আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ যদি ট্রানজিট করিডর ও পরিষেবা রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে মূলধনী ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের মাসুল/ফি/চার্জ আরোপ করতে পারে।

বৃহৎ পরিসরের ট্রানজিট ও আন্তর্জাতিক ট্রাফিক পরিচালনার জন্য কতিপয় বৃহৎ আকারের প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে ৩ থেকে ৫ বছর লেগে যেতে পারে। এজন্য অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে একটি বা দুটো কনটেইনার ট্রেনের ব্যবস্থা করে এবং উচ্চ মূল্যসম্পন্ন ও পচনশীল পণ্যের জন্য সড়ক ট্রানজিটের ব্যবস্থা করে চীন ও ভারতকে সীমিত ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে বাংলাদেশকে সক্ষম হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগ পুনর্বাসনে জরুরিভিত্তিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি আখাউড়া রেল ইয়ার্ড ও আশুগঞ্জ নদী বন্দরে একটি কনটেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন নেটওয়ার্কের কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে সড়কপথে কেবলমাত্র ১০ টন এক্সেল লোড ট্রাক যাতায়াতের অনুমতি দেয়া এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত। তবে ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা ব্যবহার করে সড়ক ট্রানজিট করিডরের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের ও পচনশীল পণ্য পরিবহনের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। আরেকটা বিকল্প হতে পারে একাধিক দেশের মালিকানাধীন পরিবহন কোম্পানি গঠনের নিমিত্তে একটা আঞ্চলিক উদ্যোগ, যার অংশীদার হবে বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমার। এ কোম্পানির মালিকানায় থাকবে মাঝারি ধরনের মাল্টি-এক্সেল ট্রাক ট্রেইলার ও কাভার্ড ভ্যান এবং বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট পণ্য বহনের সুবিধার্থে এসব যানের নিবন্ধন থাকবে। বাংলাদেশের সড়ক নেটওয়ার্কের কাঠামোগত দুর্বলতা নিরসনে সুদূরপ্রসারী সমাধান হবে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যমান জাতীয় মহাসড়কের পাশ দিয়ে বা উপরে উচ্চ মানসম্পন্ন এক্সপ্রেস ওয়ে (টোল বা শুল্কপথ) নির্মাণ করা যার দুই পাশে সার্ভিস লেনের ব্যবস্থা থাকবে।

ট্রানজিট থেকে প্রত্যাশিত সুবিধা পেতে হলে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করিডরসমূহ দিয়ে ট্রানজিট পণ্যবাহী যানের নিরবচ্ছিন্ন চলাচলে সহায়তাকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হবে। যেহেতু ট্রানজিট থেকে সুবিধা প্রাপ্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হবে সেহেতু ট্রানজিট করিডরসমূহের বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের জন্য ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড় করতে হবে এবং সৃষ্ট সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সম্পদের সংস্থান থাকতে হবে।

ব্যবহারকারী মাসুল/ফি আদায় পদ্ধতির আওতায় চিহ্নিত ট্রানজিট করিডরসমূহে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি গড়ে তোলা হলে প্রথম ৫ বছরে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করবে। এ ৫ বছরের মধ্যে যদি অবকাঠামো ও সুবিধাদি সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হয় তাহলে ষষ্ঠ বছর থেকে বাংলাদেশ বছরে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি আয় করবে। আর ১১তম বছর থেকে বার্ষিক আয় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং দীর্ঘমেয়াদে তা ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছুবে। বাংলাদেশের দিকে ধাবিত ফ্রেইট ট্রাফিকের ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে সামগ্রিক লাভ-ক্ষতির

বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ট্রানজিট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা বাংলাদেশের জন্য একটা লাভজনক বিষয়।

এ প্রবন্ধে বিস্তারিত লাভ-ক্ষতি বিশ্লেষণের জন্য আবশ্যক বিশ্লিষ্ট ও হালনাগাদ তথ্যের ঘাটতির কারণে বিভিন্ন সরলীকৃত অনুমান গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং ফলাফলকে সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি নীতি প্রণয়নের জন্য আরও বিশদ বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এ সমীক্ষা একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার বিকল্প নয় যার প্রয়োজন হবে প্রকল্পসমূহ নেবার সময়। তবে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাংলাদেশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর ও চীনের ইউনান প্রদেশের ট্রানজিটের কার্যকর গেটওয়ে হিসেবে কাজ করতে পারে।

বাংলাদেশকে আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক চুক্তিসমূহ সুচিন্তিতভাবে নেগোশিয়েট করা দরকার কারণ আঞ্চলিক চুক্তি যেমন বিসিআইএম কোনো উপআঞ্চলিক চুক্তি হতে পারে না ভুটান, নেপাল ও ভারতকে আক্ষরিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, যা একটি অনাবশ্যক প্রয়াস। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোন অপশনটি দেশের জন্য অধিকতর সুবিধা নিয়ে আসবে ও লাভজনক হবে তা নির্ধারণে একটি ব্যাপকভিত্তিক তুলনামূলক মূল্যায়ন আবশ্যক। এছাড়া অংশীদার দেশসমূহের সাথে আলোচনার টেবিলে তোলার জন্য সুচিন্তিতভাবে বিকল্পসমূহ প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেগুলো নিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের বিপরীতে জোরালোভাবে দরকষাকষি করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

Islam, S. (2008): *Bangladesh-China-Northeast India: Opportunities and Anxieties*, ISAS Insights, No.36, September 2008, National University of Singapore.

Misra, U. (1991): *Nation Building and Development in North East India*, Purbanchal Prakashan, Guwahati.

Murshid, K. A. S. (2011): "Transit and Transshipment: Strategic Considerations for Bangladesh and India," *Economic and Political Weekly*, 46(17), pp. 43-51.

Newbery, D. M. (1988): "Road User Charges in Britain," *Economic Journal*, 98(390), pp. 161-176.

PADECO (2009): *Preparing the South Asia Subregional Economic Cooperation Transport Logistics and Trade Facilitation Project*, Asian Development Bank.

——(2014): Data Collection Survey on Transport Infrastructure Development for Regional Connectivity in and Around South Asia, Final Report submitted to Japan International Cooperation Agency.

Sachdeva, G. (2006): India's North East – Rejuvenating a Conflict Ridden Economy, SAIR at *www.satp.org/satporgtp/.../Fault6-GSach-F.htm*, accessed in June 25, 2013.

SRMTS (2006): *SAARC Regional Multimodal Transport Study*. Kathmandu: SAARC Secretariat.

Thapliyal, S. (1999): "India–Bangladesh Transportation Links: A Move for Closer Co-operation," *Strategic Analysis*, 22(12), pp. 1921-1931.

Transport Cost Literature Review at www.vtpi.org, accessed in June 25, 2013.

UNESCAP (1995): Trans-Asian Railway Route Requirements: Development of the Trans-Asian Railway in the Indo-China and ASEAN Subregion, Section 3, Volume 3, Bangkok.

Yunus, M. (2013): "Economic Gains from Developing Functional Transit Facilities in Bangladesh," a paper presented at the UN ESCAP's ARTNeT Conference, Macao, China

পরিশিষ্ট ক: পরিসংখ্যান সারণি

পরিশিষ্ট ১

বিভিন্ন ট্রানজিট করিডর দিয়ে সম্ভাব্য ডাইভারশন

করিডর	ডাইভারশন	পরিমাণ (টিইইউ)
	সড়ক ট্রানজিট করিডরসমূহ	
সড়ক-২	আসাম, মনিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ড ১৫%, ইউনান ০.৫%	১,৬৩,৪৯৭
সড়ক-৩	ত্রিপুরা ২০%, ইউনান ১%	১৪,৭৬২
সড়ক-৪	মেঘালয় ১০০%	৭,১৭৭
সড়ক-৫	আসাম, মনিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ড ২০%, ইউনান ৫.০%	৩৪,৬৩৮
সড়ক-৬	ত্রিপুরা ২০%, ইউনান ১%	৪১,৬৪০
সড়ক-৭	পশ্চিম বঙ্গ ৫% এবং নেপাল ৫০%	৪৫,৭১৯
সড়ক-৮	আসাম ১০% এবং ভূটান ১০০%	৮,৬৮৯
	রেল ট্রানজিট করিডরসমূহ	
রেল-১	আসাম, মনিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ড ৭০%, ইউনান ৩%	৭,৬৫,৪৯৫
রেল-২	ত্রিপুরা ৮০%, ইউনান ৪%	৭৩,৬০৪
রেল-৩	আসাম ৭০% এবং মনিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ড ৮০%, ইউনান ১০%	৮১,৬১৪
রেল-৪	ত্রিপুরা ৮০%, ইউনান ১৫%	৭২,৫৪৫
রেল-৫	নেপাল ৫০%	-
	নৌপথ ট্রানজিট করিডর	
নৌপথ-১	আসাম, মনিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ড ১৫%, ইউনান ১.৫%	১,৬৭,২৫৮
মোট		১৪,৭৬,৬৩৮

উৎস: প্রবন্ধে উল্লেখিত অনুমানের ভিত্তিতে লেখকের হিসাব।

পরিশিষ্ট ২

লাভ-ক্ষতি পর্যালোচনার ফলাফল

করিডর	পরিমাপক	ফলাফল	র‍্যাংক
	সড়ক ট্রানজিট করিডরসমূহ		
সড়ক-২	আইআরআর (%)	১১৫.৪৪	১
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৪০.২০	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৭৮০.৬৮	
সড়ক-৩	আইআরআর (%)	৫৯.৬৮	৫
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৯.১৮	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১১৭.১৪	
সড়ক-৪	আইআরআর (%)	২৯.০০	৭
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	২.৬১	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৪৪.১৫	
সড়ক-৫	আইআরআর (%)	৫৪.৭৯	৩
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৭.৭৫	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২৯৬.৯৫	
সড়ক-৬	আইআরআর (%)	৮৩.০২	৪
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	১৮.৫২	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২৫৯.৫২	
সড়ক-৭	আইআরআর (%)	৩৩.৮৭	২
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৩.৩০	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৪৭০.০৮	
সড়ক-৮	আইআরআর (%)	৪১.৫৭	৬
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৪.৬৫	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৮৭.৮৫	
	রেল ট্রানজিট করিডরসমূহ		
রেল-১	আইআরআর (%)	৪১.৮০	১
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৫.০৫	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৪৮৫৬.১৯	

(চলমান পরিশিষ্ট ২)

করিডর	পরিমাপক	ফলাফল	র‍্যাংক
রেল-২	আইআরআর (%)	৪৪.৮৮	২
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৫.৬৫	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৪৬.৬১	
রেল-৩	আইআরআর (%)	২৭.৮৭	৩
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	২.৫৬	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩৩৯.৫৪	
রেল-৪	আইআরআর (%)	৪৮.৪৯	৪
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৫.৭৪	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২৭০.২০	
ট্রানজিট করিডর (মোডস)			
সড়ক	আইআরআর (%)	৫৯.৬৪	২
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৯.১৬	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩০৫৬.৩৮	
রেল	আইআরআর (%)	৪০.৫৯	১
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৪.৭৬	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৫৮১২.৫৩	
নৌপথ	আইআরআর (%)	১০২.৭৬	৩
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৩৬.৩০	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১৪৩৭.৪২	
সামগ্রিক ট্রানজিট	আইআরআর (%)	৪৭.৪৫	
	লাভ-ক্ষতির অনুপাত	৬.২৫	
	নীট বর্তমান মূল্য (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১০৩০৬.৩৪	